৩৩-৩৪
দুই খন্ড একত্রে
দস্যু বনহুর
ঝাম জঙ্গলে
রোমেনা আফাজ
BELAL

ঝাঁম জঙ্গলে দস্যু বনহুর-৩৩
ধূমকেতু-৩৪

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

বাদল ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলা বাজার
ঢাকা-১১০০।

নতুন সংস্করণ ঃ নভেম্বর ১৯৯৭ ইং

মূল্য ঃ ৩০·০০ টাকা মাত্র।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি, কে, দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০।

আমার প্রান প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরনা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

ঝাঁম জঙ্গল অভিমুখে রওয়ানা দেবার পূর্বে বনহুর তার উচ্চ আসনের পাশে এসে দাঁড়ালো। জমকালো ড্রেসে আবৃত তার দেহ, মাথায় পাগড়ী, পায়ে ভারী বুট, কোমরের বেল্টে গুলী—ভরা রিভলভার, পিঠে বাঁধা রাইফেল।

রহমান এবং অন্যান্য অনুচরের দেহেও জমকালো ড্রেস, পায়ে বুট আর প্রত্যেকের পিঠেই বাঁধা রয়েছে রাইফেল। এক এক জনের চোখেমুখে কঠিন—সংগ্রামিক চিহ্ন ফুটে উঠেছে। মৃত্যুকূপে ঝাপিয়ে পড়তেও তাদের নেই যেন এতোটুকু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠে—ভাই এ, তোমরা জানো আমাদের এ যাত্রা অত্যন্ত সংগ্রামময়। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে চলেছি আমরা। প্রতিশোধ নিতে চলেছি আমাদের ভাই কাওসার আর সাইফুদ্দিনের নৃশংস হত্যার। মনে রেখো ভাই এ, যতক্ষণ আমরা শয়তান মঙ্গল ডাকুকে গ্রেফতার বা নিহত করতে সক্ষম না হয়েছি ততক্ষণ আমাদের এ সংগ্রাম চলবে।

সকল অনুচর একসঙ্গে বলে উঠলো—আমরা শপথ গ্রহণ করলাম, যতক্ষণ আমরা শত্রুকে পরাজিত করতে না পারবো ততক্ষণ আমরা বিশ্রাম গ্রহণ করবো না।

উচ্চকণ্ঠে বনহুর বলে উঠলো—সাবাস!

তারপর সে আসনের পাশ থেকে নেমে এলো নিচে। দরবার -কক্ষ ত্যাগ করে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে এলো বাইরে। বনহুরের পিছনে তার অনুচরগণ তাকে অনুসরণ করে চললো।

আস্তানার বাইরে এসে দাঁড়ালো সবাই; যেখানে তাদের অশ্বগুলো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছিলো। অসংখ্য মশাল জ্বলে উঠলো দপ দপ করে।

একে রাত্রির অন্ধকার তারপর গভীর জঙ্গলে অসংখ্য মশালের আলো সৃষ্টি করলো এক অদ্ভুত দৃশ্য। এ দৃশ্য সহসা কেউ লক্ষ্য করলে ভয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কেশব এতদিন ধরে সব দেখছে; যদিও সে পূর্বেই ফুলের নিকটে বনহুর সম্বন্ধে সব অবগত হয়েছিলো তবু বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। আজ কেশব লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখলো—কোথায় যাচ্ছে ওরা? কেনই বা যাচ্ছে? কিই

বা উদ্দেশ্য---কেশব যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না তার বাবু দস্যুসর্দার।

বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসতেই অন্যান্য অনুচর উঠে বসলো নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে। একসঙ্গে অশ্বগুলো সম্মুখের পা তুলে চিঁহিঁ চিঁহিঁ শব্দ করে উঠলো।

ছুটতে শুরু করলো বনহুরের অশ্ব তাজ।

অন্যান্য অশ্বও ছুটতে শুরু করলো তাজের সঙ্গে সঙ্গে।

গহন জঙ্গল অতিক্রম করে ছুটে চলেছে দস্যু বনহুরের দল। শুধু অশ্ব-পদশব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না। আর আলো, শুধু আলো—মশালের আলোতে বনভূমি আলোকিত হয়ে উঠেছে। উঁচুনীচু টিলা আর জলাভূমির মধ্য দিয়ে তীর বেগে ছুটছে বনহুরের দল। মশালের আলোতে তাদের দেহের জমকালো ড্রেসগুলো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিলো।

জঙ্গলের হিংস্র জীবজন্তুগুলো ভয়ে পালাচ্ছিলো এদিক সেদিকে। ব্যাঘ্র আর সিংহের গর্জন অশ্বখুরের শব্দে চাপা পড়ে যাচ্ছে। রাত ভোর হবার পূর্বেই তারা ঝাঁম জঙ্গলে পৌছবে।

❑

বনহুরের দল যখন বন-জঙ্গল ভেদ করে উর্ধ্বশ্বাসে অগ্রসর হচ্ছিলো তখন ঝাঁম জঙ্গলের অভ্যন্তরে শিবমন্দির থেকে সুড়ঙ্গ পথে বেরিয়ে এলো মঙ্গল ডাকু—তার সঙ্গে কয়েকজন সহচর।

শিবমন্দিরে আজ তাদের পূজা হবে।

মন্দিরের সম্মুখে অসংখ্য ডাকাত দণ্ডায়মান। সবাই নত মস্তকে প্রতীক্ষা করছে—শিবপূজা শেষ হবার পরই তারা যাত্রা শুরু করবে। দস্যু বনহুরের সন্ধানে তাদের এ অভিযান।

পুরোহিত সন্ন্যাসী বাবাজী শিবলিঙ্গের সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে।

মঙ্গল ডাকু এসে বসলো পুরোহিত ঠাকুরের পাশে, তার কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচরও বসলো হাঁটু গেড়ে।

পূজা শুরু হলো।

একদল ডাকু ঢাক বাজিয়ে চলেছে।

পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করছে।

সম্মুখস্থ অগ্নিকুণ্ড থেকে ধূপের ধূয়া ছড়িয়ে পড়ছে মন্দির মধ্যে। পুরোহিতের সঙ্গেই মন্ত্র উচ্চারণ করছে মঙ্গল ডাকু স্বয়ং। তার সঙ্গে অনুচরগণও মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে।

একসঙ্গে যখন মন্ত্র উচ্চারণ হচ্ছিলো, তখন বনভূমির মধ্যে যেন মেঘ গর্জনের মত শোনা যাচ্ছিলো। এক একটা ডাকুর সেকি ভীষণ চেহারা। মাথায় ঝাকড়া চুল, এক একজনের চোখগুলো যেন আগুনের ভাটার মত জ্বলছে। তেমনি কর্কশ গম্ভীর তাদের কণ্ঠস্বর।

পূজা শেষ হবে, এমন সময় মন্দিরের বাইরে শোনা গেলো অসংখ্য অশ্বের পদশব্দ। বন-জঙ্গল যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো সে শব্দে।

পরক্ষণেই বিপদ—সংকেতধ্বনি ভেসে এলো।

মঙ্গল ডাকু এবং তার অনুচরগণ আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। গহন জঙ্গলে মঙ্গল ডাকুর অনুচরগণ এখন পূজায় রত। পূজা শেষে তারা মন্ত্র গ্রহণ করবে।

মঙ্গল ডাকু সেদিন তার অনুচরগণের নিকটে যখন জানতে পেরেছিলো দস্যু বনহুরের দল তার কয়েকজন অনুচরকে হত্যা করেছে এবং একজনকে ধরে নিয়ে গেছে, তখন সে ভীষণভাবে ক্ষেপে গিয়েছিলো। দস্যু বনহুরের নাম শুনতেই তার শরীরে আগুন ধরে যাচ্ছিলো। তারপর সেই দস্যু বনহুর তার অনুচরদের নিহত করেছে আর একজনকে ধরে নিয়ে গেছে—কথাটা শুনে রাগে সে অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠেছিলো, আদেশ দিয়েছিলো অনুচরদের প্রতি—তোমরা তৈরি হয়ে নাও, আমি অচিরেই দস্যু বনহুরের সন্ধানে বের হবো। তাকে যতক্ষণ না শায়েস্তা করেছি ততক্ষণ আমার স্বস্তি নেই।

আজ সে কারণেই শিবপূজা করছিলো মঙ্গল ডাকু। যখনই সে দস্যুতা বা লুটতরাজ করতে বের হতো তখনই সে শিবপূজা শেষ করে নিতো।

পূজা শেষ হবার পূর্ব মুহূর্তে অসংখ্য অশ্বারোহী ঘিরে ফেললো শিবমন্দির। পালাবার সময় পেলো না কেউ।

অশ্বারোহিগণ অন্য কেউ নয়—তারা দস্যু বনহুরের দল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণভাবে আক্রমণ করলো ওরা মঙ্গল ডাকুর দলকে। ক্ষিপ্তের মত উন্মাদ হয়ে উঠলো সবাই।

দু'দলে শুরু হলো ভীষণ যুদ্ধ।

অল্পক্ষণেই মঙ্গল ডাকুর দল ছত্রভঙ্গ হয়ে কে কোথায় অন্তর্ধান হলো, আর দেখা গেলো না।

বনহুর প্রবেশ করলো শিবমন্দিরে।

কিন্তু তার পূর্বেই মঙ্গল ডাকু আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছে।

বনহুর স্মরণ করলো মঙ্গল ডাকুর অনুচর মৃত্যুর পূর্বে তাদের কাছে প্রকাশ করেছিলো—ঝাঁম জঙ্গলে শিবমন্দিরের মধ্যেই আছে একটি সুড়ঙ্গপথ, সে পথে প্রবেশ করলেই পাওয়া যাবে মঙ্গল ডাকুর আস্তানা।

বনহুর যখন শিবমন্দির মধ্যে সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান করে চলেছে তখন মঙ্গল ডাকু বা তার কোনো অনুচরের টিকিটি পর্যন্ত ছিলো না। শুধু এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে কতগুলো নিহত মানবদেহ।

বনহুর মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করে সন্ধান করতে লাগলো সেই সুড়ঙ্গপথ কোথায়? আর সেই ডাকু মঙ্গলই বা গেলো কোথায়? বহুকালের পুরোন মন্দির হলেও মন্দিরটা মজবুতভাবে তৈরি—কোথাও ভাঙ্গাচুরা বা ফাটল নেই। পাথরের মত মসৃণ মন্দিরের দেয়ালটা।

বনহুর আশ্চর্য হয়ে অন্বেষণ করে চললো—লোকটা কি তবে মিথ্যা বলেছিলো তাদের কাছে! কই, মন্দিরের মধ্যে কোথাও কোনোরকম চিহ্ন পর্যন্ত নেই যেখানে কোনো সুড়ঙ্গমুখ থাকতে পারে কিন্তু সে লক্ষ্য করেছে-মন্দিরমধ্যেই ছিলো কয়েকজন দস্যু এবং তার মধ্যেই যে মঙ্গল ডাকু ছিলো তাতে কোনো ভুল নেই। তবে তারা গেলো কোথায়?

বনহুরের সঙ্গেই ছিলো রহমান আর কায়েস। অন্যান্য অনুচর বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো, মঙ্গল ডাকু এবং তার অনুচরদের সন্ধানে, কিন্তু কোথাও তাদের খোঁজ পাওয়া গেলো না।

রহমান আর কায়েস যখন মন্দিরের পিছন দিকে এগিয়ে গেছে তখন বনহুর ঠিক শিবলিঙ্গটার উপরে হাত রেখে খুব জোরে চাপ দিয়ে দেখছিলো কোনো কৌশল এখানে আছে কিনা—বনহুর যেমন লিঙ্গটা বলিষ্ঠ হাতে ধরে খুব জোরে একপাশে ঠেলে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আচমকা বনহুর পড়ে গেলো এক অন্ধকারময় গর্তে।

বনহুর যখন গর্তটার মধ্যে পড়ে গেলো তখন রহমান আর কায়েস তার নিকট হতে বেশ দূরে সরে গিয়েছিলো, যদিও মন্দিরের মধ্যেই ছিলো তারা, তবু মোটেই টের পেলো না। কোনোরকম শব্দও হয়নি, যেন যাদুমন্ত্রে কোথায় উবে গেলো ধূমকেতুর মত।

রহমান আর কায়েস সর্দারকে না দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। মনে করলো সর্দার কি তাদের না বলেই মন্দিরের বাইরে চলে গেছে! হয়তো তাই হবে।

রহমান মন্দিরের বাইরে এসে সন্ধান করেও যখন সর্দারকে পেলো না তখন চিন্তিত হয়ে পড়লো। সংকেতধ্বনি করে অনুচরদের আহ্বান জানানো হলো। একরকম ভেঁপু ধরনের চোং আছে, তাতেই ফুঁ দিলো রহমান নিজে।

এ রকম সংকেতধ্বনি তারা ঐ মুহূর্তে করে থাকে যে মুহূর্তে তারা সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়।

সংকেতধ্বনি শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব নিয়ে সবাই দ্রুত এসে একত্রিত হলো মন্দিরের সম্মুখে। রহমান নিজের অশ্বের পাশে দাঁড়িয়ে বললো—ভাই এ, একটা দুঃসংবাদ—আমাদের সর্দারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। না জানি

সর্দার কোথায় গেলেন! তিনি যে নিজ ইচ্ছায় আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাননি তা নিশ্চিত।

সমস্ত অনুচরের মুখ গম্ভীর বিষাদময় হলো, এতোক্ষণ যে উদ্যমে তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলো নিমিষে তা যেন মুছে গেলো। একটা অজানা আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়লো তাদের চোখেমুখে।

রহমান আদেশ করলো—এসো আমরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সর্দারের সন্ধান করি।

আবার চললো অনুসন্ধান।

সমস্ত ঝাঁম জঙ্গল চষে ফেললো, মন্দিরের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খোঁজা শুরু হলো তবু কোথাও সর্দারের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেলো না।

ওদিকে বনহুর যখন শিব লিঙ্গটায় খুব জোরে জোরে চাপ দিচ্ছিলো তখন হঠাৎ তার পায়ের নিচে মেঝেটা সরে যায়—এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায় গর্তের মধ্যে। আসলে সেটা গর্ত নয় একটা সুড়ঙ্গমুখ। এ সুড়ঙ্গমুখের কথাই বলেছিলো মঙ্গল ডাকুর অনুচরটি।

বনহুর সুড়ঙ্গমধ্যে পড়ে যেতেই দেখতে পায় তার চারপাশে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য সুতীক্ষ্ণধার বর্শা। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দু'জন বলিষ্ঠ লোক ধরে ফেললো বনহুরের বাহুদ্বয়।

বনহুর মুহূর্তের জন্যও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো না, সে বুঝতে পারলো, তাকে কৌশলে বন্দী করলো মঙ্গল ডাকু।

সম্মুখে তাকাতেই একজন অসুরের মত ভয়ঙ্কর লোককে দেখতে পেলো বনহুর। লোকটা সাধারণ মানুষ নয়—তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সেকি ভীষণ আকার! মাথায় এক আংগুল ছোট করে ছাটা চুল। সজারুর কাঁটার মত খাড়া একজোড়া গোঁফ। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাটার মত জ্বলছে। শরীরের মাংশপেশীগুলো যেন পাথরের মত শক্ত-কঠিন মনে হচ্ছে। বনহুরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো লোকটা। প্রথম নজরেই বনহুর অনুমান করে নিলো—এ শয়তানই ঝাঁম জঙ্গলের সর্দার মঙ্গল ডাকু। তীক্ষ্ণ নজরে তাকালো বনহুর ওর দিকে।

মঙ্গল ডাকুর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। দৃঢ় মুষ্টিতে আচমকা চেপে ধরলো বনহুরের গলার কাছে জামাটা।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের দক্ষিণহস্তের বজ্রমুষ্টি গিয়ে পড়লো মঙ্গল ডাকুর নাকের উপর। আশ্চর্য, বনহুরের মুষ্ট্যাঘাতে মঙ্গল ডাকু এতোটুকও টললো না।

বনহুর যে মুহূর্তে মঙ্গল ডাকুর নাকের উপর মুষ্ট্যাঘাত করেছিলো সেই দণ্ডে তার চারপাশের অস্ত্রধারিগণ বনহুরের দেহে বর্শা বিদ্ধ করতে উদ্যত হলো।

মঙ্গল ডাকু হাত দিয়ে তাদের ক্ষান্ত হবার জন্য ইংগিত করলো; এবার মঙ্গল ডাকু বনহুরের জামার কলার চেপে ধরে ঝাকুনি দিলো, তারপর দাঁত পিষে বললো....কে তুমি বলো?

এতোক্ষণে বনহুর আশ্বস্ত হলো যেন, যাক শয়তানটা তাহলে তার পরিচয় জানে না। বনহুর বললো—আমি তোমার বন্ধু।

বন্ধু! হাঃ হাঃ হাঃ, বন্ধুই বটে! তাহলে আচমকা এ আক্রমণ করে আমাদের পূজা নষ্ট করলে কেন বন্ধু?

বনহুর ওকে যতখানি মূর্খ বন্য পশু ভেবেছিলো, ওর কথায় সে ভুল ভেংগে গেলো। বুঝতে পারলো, শয়তানটার মাথায় বেশ বুদ্ধি আছে। কথা বলার ঢং দেখে বনহুর অবাকও হলো কিছুটা, স্থিরকণ্ঠে বললো—পূজা নষ্ট করতে আসিনি, তোমার পূজায় যোগ দিতে এসেছিলাম।

অট্টহাসি হেসে উঠলো মঙ্গল ডাকু—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ পূজায় যোগ দিতে এসেছিলে? তা ভালই করেছো, এবার বলো কে তুমি?

আমি তো বললাম, তোমার বন্ধু।

জানো আমার কাছে বন্ধুর পরিণতি অতি নির্মল? আমি বন্ধুকে তার মর্যাদাস্বরূপ অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করে থাকি।

চমৎকার! আমিও বন্ধুর কাছে সেরূপ মর্যাদাই কামনা করে থাকি।

এমন সময় একজন অনুচর বলে উঠে—হুজুর, এ লোকটা নিশ্চয়ই দস্যু বনহুরের অনুচর।

হাঁ ঠিক্ বলেছো, আমারও সেরকম মনে হচ্ছে। দস্যু বনহুরের লোক ছাড়া এমন কথাবার্তা আর কোনো দলের লোক বলতে পারবে না—বলো তুমি দস্যু বনহুরের অনুচর কিনা?

তোমাদের অনুমান মিথ্যা নয়।

মঙ্গল ডাকুর চোখ দুটো মশালের আলোতে জ্বলে উঠলো তীব্রভাবে। দাঁতে দাঁত ঘষে বললো—আমি প্রথমেই মনে করেছিলাম দস্যু বনহুরের দল ছাড়া আমার লোকদের পরাজিত করে কার শক্তি! এবার মঙ্গল ডাকু নিজের অনুচরগণকে লক্ষ্য করে বললো—নিয়ে চলো আস্তানার ভিতরে।

বনহুর বুঝতে পারলো, সে ঠিক পথেই প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও বন্দী হওয়ায় একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছে সে তবু মনে মনে খুশিও হয়েছে। কৌশলে মঙ্গল ডাকুকে হাতের মুঠায় আনতে তাকে বেগ পেতে হবে না আর।

চতুর্দিকে অস্ত্র বাগিয়ে ধরে বনহুরকে নিয়ে অগ্রসর হলো মঙ্গল ডাকু ও তার অনুচরগণ। বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য রেখে চলছিলো, যদিও তার চারিপাশে ঘিরে রয়েছিলো অগণিত অস্ত্রধারী দস্যুদল।

মঙ্গল ডাকু সর্বপ্রথম চলছিলো।

বনহুরের মুখমণ্ডল কঠিন, তার সঙ্গে এখনও সবগুলো অস্ত্র রয়েছে পিঠে ঝুলছে রাইফেল, কোমরের বেল্টে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা। রিভলভারও রয়েছে ছোরার পাশে বেল্টের সঙ্গে। এতোগুলো অস্ত্র সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও বনহুর যেন নিরীহ মানুষটির মত এগিয়ে চলেছে। ইচ্ছা করলে সে এদের কাবু করতে পারে কিন্তু পালানোর পথের সন্ধান তার জানা নেই, কাজেই নীরবে এদের কথা পালন করাই এখন শ্রেয়ঃ।

যে পথে বনহুর এখন অগ্রসর হচ্ছিলো সে পথ যে অত্যন্ত গোপনীয় কোনো সুড়ঙ্গপথ তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো। কারণ সে পথে কোনোরকম বাইরের আলো প্রবেশ করছিলো না।

মশালের আলো ছাড়া আর কোনো আলোই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না সে পথে। অনেকক্ষণ লাগলো—বনহুরকে নিয়ে ওরা পৌঁছলো একটা মস্তবড় ঘরে। বিস্মিত হলো বনহুর সে ঘরে প্রবেশ করে—মশালের আলোতে তাকিয়ে দেখলো ঘরটার মধ্যে অনেকগুলো লোককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কারো হাতে-পায়ে লৌহশিকল কেটে বসে গেছে, কারো গলায় শিকল বাঁধা—কতদিন যে তার গলায় শিকল পরা রয়েছে যার দরুন গলায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। কারো চক্ষুদ্বয় অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা দ্বারা অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারো জিভ কেটে ফেলা হয়েছে, রক্ত ঝরছে মুখ দিয়ে। সেকি নির্মম মর্মান্তিক দৃশ্য! বনহুরের দস্যু-প্রাণও কেঁদে উঠলো, এ দৃশ্য সে যেন সহ্য করতে পারছিলো না।

বনহুর হতবাক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো এ সব অসহায় বন্দীদের দিকে। বনহুর নিজেও বহু বন্দীকে নির্মম সাজা দিয়েছে বা হত্যা করেছে কিন্তু এভাবে তিল তিল করে নয়।

কঠিন কণ্ঠে বললো বনহুর—মঙ্গল, এরা তোমার কাছে কি অপরাধ করেছিলো যার জন্য হত্যা না করে এ ভাবে শাস্তি দিচ্ছো?

বন্দীর মুখে তার নাম শুনে অবাক হলো মঙ্গল ডাকু। বললো সে—আমার নাম জানলে কি করে?

তোমাকে দেখেই আমি নাম জেনে নিয়েছি।

বড় সুচতুর দেখছি তুমি! বললো মঙ্গল ডাকু।

বনহুর হাসলো।

মঙ্গল ডাকু বললো—জানো এদের মতই তোমাকেও বন্দী করে রাখা হবে।

সে কথা আমি প্রথমেই অনুমান করে নিয়েছি। কিন্তু আমি জানতে চাই, এরা কি অপরাধ করেছিলো যার জন্য এদের এ রকম শাস্তির ব্যবস্থা করেছো?

মঙ্গল ডাকু বললো এবার—জানতে চাও এদের অপরাধের কথা?

হাঁ বলো?

তোমাকেও এমনি সাজা দেওয়া হবে যদি তুমি আমাদের কথা না শোনো।

আমাকে শাস্তি দেবার পূর্বে আমি এদের কথা জানতে চাই?

শোনো দস্যু, আমি জানি তুমি দস্যু বনহুরের লোক—আর এও জানি, তোমরা সহজে তোমাদের সর্দারের সন্ধান দিতে রাজী নও। জানো এ কারণেই আমি তোমাদের দলের দু'জনকে নির্মমভাবে হত্যা করেছি, তবু তারা তাদের সর্দারের সন্ধান বলেনি বা আস্তানার খোঁজ দেয়নি। তুমি যদি এ ব্যাপারে তোমার ভাইদের মত আচরণ করো তাহলে তোমার মৃত্যু এদের মত হবে না।

বেশ, তুমি যেভাবে চাও আমাকে হত্যা করো তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই।

কি বললে—তুমিও মরবে তবু সর্দারের সন্ধান দেবে না?

আমি সর্দারের সন্ধান দেবো, তার পূর্বে জানতে চাই—এরা—এই বন্দিগণ তোমাদের কাছে কি দোষ করেছিলো?

মঙ্গল ডাকু তার অনুচরদের ইংগিত করলো কয়েকজন থাকবে আর বাকীগুলো বেরিয়ে যাবে।

মঙ্গল ডাকুর আদেশ অনুসারে বেরিয়ে গেলো কয়েকজন অনুচর, আর মশাল হস্তে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েকজন।

মঙ্গল ডাকু বললো—এই যে বৃদ্ধ লোকটাকে দেখছো এর অবস্থা অত্যন্ত ভাল—রাজাধিরাজ! আমি এর কাছে চেয়েছিলাম ওর কন্যা শমশেরী বানুকে, কিন্তু ও দেয়নি—তাকে অন্যদেশে বিয়ে দিয়ে নিজে রেহাই পেতে চেয়েছিলো.....হেসে উঠলো মঙ্গল ডাকু, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—মঙ্গল ডাকুর কাছে রেহাই পাবে না কেউ, হত্যা করলে কষ্ট হবে কি করে, তাই আজ সাত বছর ধরে ওকে গলায় শিকল পরিয়ে বন্দী করে রেখেছি; জানে মারবো না। এক সপ্তাহ পর মরা গরুর মাংস সিদ্ধ করে খেতে দেই, তাই খেয়ে বেঁচে আছে আজও......হাঃ হাঃ হাঃ মরবে না, মরতে দেবো না কিন্তু যতদিন না শমশেরী বানুকে পাবো ততদিন আমি ওকে এভাবে শাস্তি দেবো।

বনহুরের দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ হলো, মঙ্গল ডাকু সম্বন্ধে সে পূর্বে যা অবগত হয়েছিলো সে কথা মিথ্যা নয় তবে। একবার হাতখানা কোমরের বেল্টে রিভলভারে গিয়ে ঠেকলো কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিলো সে অতি কষ্টে।

বনহুর তাকালো বৃদ্ধের ওপাশে একটা জিহ্বা ছেদন-করা বন্দীর দিকে। কি করুণ সুরে সে গোঙাচ্ছে! তখনও তার মুখ দিয়ে দলা দলা জমাট রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

মঙ্গল ডাকু বললো—এ শয়তান আমাকে মিথ্যা ধোকা দিয়েছিলো, আমাকে ভুল পথে নিয়ে গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেবার সুযোগ খুঁজেছিলো, তাই আমি ওর উল্টা শাস্তি দিয়েছি। মরবে না সহজে কিন্তু খেতেও পারবে না বা কথাও বলতে পারবে না। আর ঐ যে দেখছো ওকে শিকল পরিয়ে রেখেছি আজ তিন বছর, আমার দলের লোককে হত্যা করেছিলো বলে। আর ঐ যে লোকটা, চোখ দুটো ওর অগ্নিদগ্ধ করে অন্ধ করা হয়েছে......

বনহুর কঠিন কণ্ঠে বলে উঠে—থামো আর শুনতে চাই না। শয়তান ওরা নয়—তুমি.....বনহুর রিভলভারে হাত দেবার পূর্বেই মঙ্গল ডাকু বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে বনহুরের হাত।

বনহুর এক ঝটকায় মুক্ত করে ফেলে নিজের হাতখানা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশে অসংখ্য উদ্যত বর্শা লক্ষ্য করে স্থির হয় সে।

মঙ্গল ডাকু এবার আদেশ দেয় তার অনুচরদের—এর সব অস্ত্র নামিয়ে ফেলো।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বনহুরের শরীর থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার জন্য অগ্রসর হয় কিন্তু বনহুর তাদের শরীরে হাত দেবার পূর্বেই একজনকে মুষ্ট্যাঘাতে ধরাশায়ী করে।

তৎক্ষণাৎ কয়েকটা বর্শা বনহুরের দেহে বিদ্ধ হবার উপক্রম হয়, এবারও মঙ্গল ডাকু ক্ষান্ত করে তাদের, বলে—একে হত্যা করলে আমাদের সব কিছু ব্যর্থ হবে। দস্যু বনহুরের সন্ধান এর কাছে নিতেই হবে।

বনহুরের দেহ থেকে সমস্ত অস্ত্র নামিয়ে নেওয়া হলো।

এবার নীরব রইলো বনহুর, অবশ্য কতকটা ইচ্ছা করেই সে চুপ রইলো বটে।

মঙ্গল ডাকু বললো—এই বন্দীদের শাস্তি দর্শন করেই তুমি অবাক হচ্ছো দস্যু বনহুরের অনুচর? আরও বন্দা আছে—তারা বন্দিনী বটে.....

বন্দিনী।

হাঁ, এসো আমার সঙ্গে। মঙ্গল ডাকু এগিয়ে চললো।

বনহুর অনুসরণ করলো মঙ্গল ডাকুকে।

অন্যান্য বর্শাধারী অনুচর বনহুরকে ঘিরে ধরে অগ্রসর হলো।

বন্দীকক্ষের পরই আর একটি কক্ষ; ঠিক কক্ষ নয়—যেন এক একটি গুহা। বনহুর এই গুহা বা কক্ষে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালো এবং সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণহস্তের বাজু দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে ফেললো। প্রায় আট-দশটি নারীকে উলঙ্গ অবস্থায় হাত-পা দেয়ালের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। কারো শরীরে বসন নেই, হাত-পা শিকল দিয়ে দেয়ালে আটকানো। মাথার চুল এলোমেলো বিক্ষিপ্ত। সেকি বীভৎস দৃশ্য! বনহুর দ্বিতীয়বার তাকাতে পারলো না, সে ফিরে দাঁড়ালো।

মঙ্গল ডাকু বললো—কি হলো?

বনহুর বললো—বেরিয়ে চলো এ কক্ষ থেকে।

মঙ্গল ডাকু আর বনহুর বেরিয়ে এলো, পূর্বের সেই বন্দীশালায় এসে বললো বনহুর—ঐ নারীদের তুমি কেন এভাবে সাজা দিচ্ছো?

মঙ্গল ডাকু আমার নাম, আমি কাউকে খাতির করি না। যে নারী আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করবে তাকেই আমি এভাবে সাজা দিয়ে থাকি।

বনহুরের ধমনীর রক্ত টগবগ করে উঠলো, এই মুহূর্তে ওর টুঁটি ছিড়ে ফেলতে ইচ্ছা হলো—কিন্তু এখন কোনো উপায় নেই। তাকে ধৈর্য ধরতেই হবে, না হলে কোনো কাজই সমাধা হবে না। তবু বললো বনহুর—শয়তান, তোমার মা-বোন-স্ত্রী নেই? অসহায়া নারীদের প্রতি তোমার এই কুৎসিত নির্মম আচরণ কেন?

মঙ্গল ডাকুকে জানো না বাছাধন? আমাকে শয়তান বলছো, কিন্তু কিছুক্ষণ পর জানতে পারবে তোমার নিজের অবস্থাটা কি হয়! মা-বোন-স্ত্রী.....হাঃ হাঃ হাঃ, মঙ্গল ডাকুর আবার মা-বোন-স্ত্রী? সে মানুষের সন্তান নয়।

সে তোমার আচরণেই টের পেয়েছি।

একটু দাঁড়াও আরও পাবে! মঙ্গল ডাকু ইংগিত করলো—একে লৌহশিকল দিয়ে বেঁধে ফেলো, জানতে চাই-এর সর্দার বনহুরকে, আর কোথায় তার আস্তানা?

বনহুর বললো—আমাকে শিকল পরালে আমি কোনো উত্তরই দেবো না। বরং আমাকে মুক্ত অবস্থায় তুমি যে-কোনো প্রশ্ন করবে, আমি সঠিক উত্তর দেবো।

বেশ তাই হবে, কিন্তু কোনোরকম চালাকি বা বদমাইশি করলে তোমাকে আমরা অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা দ্বারা অন্ধ করে দেবো। তাছাড়া পালাবার চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

বনহুর মঙ্গল ডাকুর কথায় কান না দিয়ে বললো—তুমি কি জানতে চাও বলো?

জানতে চাই তোমাদের সর্দার বনহুর কে? কি তার পরিচয়।

আমাদের সর্দার মানুষ—এই তার পরিচয়।

মানুষ তো আমরাও।

না, তোমরা মানুষ নও।

মানুষ নই আমরা?

না। তোমরা জানোয়ার।

কি বললে—আমরা জানোয়ার?

তা না হলে এই নিষ্পাপ মানুষগুলোকে এভাবে বন্দী করে রেখেছো কেন?

আমি জানি, তোমাদের সর্দার আমার চেয়েও নির্মম।

কিন্তু সে অমানুষ নয়! বনহুরের কণ্ঠ এবার বজ্রকঠিন শোনালো।

মঙ্গল ডাকু পর্যন্ত কেঁপে উঠলো সে কণ্ঠস্বরে, স্তব্ধ হয়ে তাকালো।

বনহুর বললো—আমাদের সর্দার বিনা কারণে বা বিনা অপরাধে কাউকে সাজা দেয় না। আর তুমি এসব নিরীহ নিরপরাধ লোকদের যেভাবে পিষে মারছো এতে তোমাকে মানুষ বলতে ঘৃণা হয়।

মঙ্গল ডাকুর চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলে উঠলো। খপ করে চেপে ধরলো বনহুরের গলার কাছে জামাটা—আমাকে তুমি ঘৃণা করো! এতো বড় সাহস তোমার?

বনহুর অতি সহজেই মঙ্গল ডাকুর হাত ছাড়িয়ে দিলো, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—তোমার মত কুকুরকে ঘৃণা ছাড়া কি করবো বলো?

মঙ্গল ডাকু তখনই আদেশ দিলো তার অনুচরগণকে—বেঁধে ফেলো মজবুত করে—তারপর শাস্তির ব্যবস্থা করবো।

মুহূর্ত বিলম্ব হয় না, কয়েকজন বলিষ্ঠ লোক বনহুরকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেললো। বাধ্য হলো বনহুর নীরব থাকতে, কারণ এই ভূগর্ভস্থ আস্তানার পথ তার জানা নেই যে পথে বের হওয়া যায়, তাছাড়া তার চারপাশে অসংখ্য বর্শা উদ্যত হয়ে রয়েছে। বনহুরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হলো।

মঙ্গল ডাকু কর্কশ কঠিন কণ্ঠে বললো—এবার বলো তোমার সর্দারের আস্তানা কোথায়?

আমার সর্দারের আস্তানা ভূগর্ভে।

ভূগর্ভে—কিন্তু কোথায়? কোন্ এলাকায় বলো?

বললে তুমি খুঁজে পাবে না, দস্যু বনহুরের আস্তানার সন্ধান পাওয়া সহজ কথা নয়।

তবু তোমাকে বলতে হবে।

কান্দাই-এর অদূরে সারথী নদীর নিচে এ আস্তানা আছে।

মনে রেখো, মিথ্যা হলে তোমাকে ভয়ঙ্কর মৃত্যু গ্রহণ করতে হবে।

মৃত্যুভয়ে ভীত না হলেও তোমার হাতে মরার হীনতা আমি সহ্য করতে পারবো না। কাজেই আমার কথার একবর্ণ মিথ্যা নয়।

সেখানেই তোমার সর্দারকে পাবো?

হাঁ, নিঃসন্দেহে।

জানো মঙ্গল ডাকু দস্যু বনহুরের প্রধান শত্রু?

জানি, কিন্তু কারণ জানি না।

কারণ মঙ্গল ডাকুর উপরে পৃথিবীর বুকে কোনো ডাকু বড় হবে—এ আমি সহ্য করবো না।

হাসলো বনহুর—দস্যু বনহুর তাহলে তোমার চেয়ে বড়?

হাঁ, আমার মনে হয় সে আমার চেয়েও বড় দস্যু।

তাই তাকে নিঃশেষ করতে চাও?

তোমার অনুমান সত্য; আমি তোমাদের সর্দারকে নির্মূল করবো। দেখ, তুমি যদি তোমাদের সর্দারের সন্ধান দাও তাহলে আমি তোমাকে আমার সহচর করে নেবো।

বনহুরের মুখোভাব প্রসন্ন হলো, খুশীভরা কণ্ঠে বললো—হাঁ, আমার ইচ্ছাও তাই।

সত্যি করে বলছো তুমি আমার দলে আসবে?

আসবো।

তোমাকে শপথ করতে হবে।

বেশ করবো।

মঙ্গল ডাকু ইংগিত করলো—একে সাবধানে বেঁধে রাখো, কাল ভোরে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে একে শপথ করতে হবে।

তারপর চলে গেলো মঙ্গল ডাকু সেখান থেকে।

এবার মঙ্গল ডাকুর অনুচরগণ বনহুরকে পাথরের দেয়ালের বালার সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখলো। ইচ্ছা করলে বনহুর বাধা দিতে পারতো কিন্তু সে বাধা দিলো না, কারণ বাধা দিয়ে তখন কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। পরদিন ভোরের প্রতীক্ষায় রইলো সে।

❑

ঝাঁম জঙ্গলের শিবমন্দির এবং সমস্ত ঝাঁম জঙ্গল তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও রহমান ও কায়েস তাদের সর্দারের কোনো খোঁজ পেলো না। দুশ্চিন্তায় রহমান মুষড়ে পড়লো, কায়েসের অবস্থাও তাই। রহমান এক কৌশল অবলম্বন করলো। এবার সে কায়েসকে গোপনে বললো—কায়েস, তুমি দলবল নিয়ে ফিরে যাও।

আর তুমি কি করবে রহমান? বললো কায়েস।

রহমান গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আমার যাওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ না আমি সর্দারের সন্ধান পেয়েছি।

সর্দার কোথায় অন্তর্ধান হলেন কি করে তার সন্ধান পাবে রহমান?

আমি জানি, শয়তান মঙ্গল ডাকুর চক্রান্তে সর্দার বন্দী হয়েছেন।

বলো কি?

হাঁ, আমার মন বলছে কায়েস।

কিন্তু কোথায় কিভাবে তাকে বন্দী করা হলো আমরা নিকটে থেকেও বুঝতে পারলাম না?

জানো না কায়েস মঙ্গল ডাকু অসাধারণ পাজী, দুর্দান্তও বটে। তার পৈশাচিক আচরণে দেশময় আজ আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কারো স্ত্রী-কন্যা-ভগ্নী এই নরপিশাচের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। আমার মনে হয়, সে সর্দারকে কৌশলে বন্দী করে ফেলেছে। কায়েস, আমি সর্দারের সন্ধান না করে ফিরে যাবো না। তোমরা যাও কিন্তু আবার আগামী রাতে তোমরা দুলকীকে নিয়ে এই জঙ্গলে আসবে। মনে রেখো, যতক্ষণ আমরা সর্দারকে না পেয়েছি ততক্ষণ নিশ্চিন্ত নই।

রহমানের নির্দেশ অনুসারে কায়েস এবার অনুচরদেরসহ ঝাঁম থেকে বিদায় গ্রহণ করলো। আবার জেগে উঠলো অসংখ্য পদধ্বনি। কায়েস যখন দলবল নিয়ে ফিরে চললো তখন রহমান আত্মগোপন করলো জঙ্গলের মধ্যে, মঙ্গল ডাকুর একটি নিহত অনুচরের দেহ থেকে রক্তমাখা পোশাক খুলে নিয়ে পরে নিলো দ্রুতহস্তে। মৃতদেহটা লুকিয়ে রাখলো একটা ঝোপের মধ্যে।

এবার রহমান নিজের ছুরি দিয়ে কপালের পাশে কিছুটা কেটে ফেললো, ঝর ঝর করে পড়তে লাগলো তাজা লাল টকটকে রক্ত। আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে রহমান মঙ্গল ডাকুর নিহত অনুচরদের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লো, মৃতবৎ পড়ে রইলো সে।

কায়েস ও তার দলবলের অশ্ব-পদশব্দ মিশে যেতে না যেতেই বেরিয়ে আসে মঙ্গল ডাকুর কয়েকজন অনুচর। আহত এবং নিহত অনুচরদের মধ্যে এসে সবাইকে তুলে নেয় কাঁধে। রহমানও বাদ যায় না, তাকেও দু'জন ধরে কাঁধে তুলে নেয়।

মঙ্গল ডাকুর অনুচরগণ রহমানকে চিনতে পারে না, করণ রহমানের দেহে তাদেরই মত পোশাক রয়েছে এবং রক্ত ঝরছে তার কপাল থেকে। সমস্ত মুখমণ্ডল আর গলা—কাঁধ রক্তে ভেসে গেছে। যন্ত্রণায় কোঁকাচ্ছে রহমান।

মঙ্গল ডাকুর অনুচরগণ রহমান এবং তাদের নিহত আর আহত অনুচরদের নিয়ে প্রবেশ করলো শিবমন্দিরের মধ্যে।

রহমান মঙ্গল ডাকুর অনুচরদের কাঁধে শায়িত অবস্থায় থেকেই লক্ষ্য করছিলো সব, যদিও তার কষ্ট হচ্ছিলো তবু সহ্য করে যাচ্ছিলো সে নীরবে—যেমন করে হোক সর্দারের সন্ধান তাকে করতে হবে। সর্দারের জন্যই রহমান নিজ দেহে অস্ত্রাঘাত করেছে। প্রাণ দিয়েও সে সর্দারকে উদ্ধার করতে চায়।

অবাক হয়ে দেখছে রহমান—এরা কি করে, কোন্ পথে তাকে কোথায় নিয়ে যায়। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করার উদ্দেশ্য কি? তবে কি মন্দিরমধ্যেই গোপন পথ আছে? যে পথে তাদের সর্দারকে উধাও করা হয়েছে।

আশায় বুক দুলে উঠে রহমানের, নিশ্চয়ই তার বাসনা সিদ্ধ হবে। রহমান গোঙানির মত শব্দ করতে থাকে, আর মাঝে মাঝে 'জল, জল' বলে ক্ষীণ শব্দ করে চলে।

মঙ্গল ডাকুর অনুচরগণ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো। প্রত্যেকের কাঁধেই আহত এবং নিহত দেহ। আহত অনুচরগুলো নানারকম করুণ আর্তনাদ করছে।

রহমান দেখলো, একজন অনুচর শিবলিঙ্গের পিছনে এসে লিঙ্গটা ধরে জোরে টান দিলো, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত কাণ্ড—সেই লিঙ্গটার পাশে বেরিয়ে পড়লো একটা বিরাট সুড়ঙ্গমুখ।

অনুচরগণ আহত এবং নিহত দেহগুলোকে নিয়ে সেই সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করলো।

এমন একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যেও রহমানের মনে আনন্দের বান ডেকে গেলো, যাক তাহলে সে ডাকু মঙ্গলের গুপ্ত আস্তানার পথ আবিষ্কার করে নিতে সক্ষম হলো। যে পথের সন্ধান করতে তারা হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলো, সর্দারকেও হারাতে হয়েছে এ পথের খোঁজ করতে গিয়ে। এবার

রহমান কতকটা আশ্বস্ত হলো—নিশ্চয়ই সর্দার এই গুপ্ত সুড়ঙ্গপথেই অদৃশ্য হয়েছে।

মঙ্গল ডাকুর অনুচরগণ অন্যান্য নিহত আর আহত অনুচরের সঙ্গে রহমানকে সুড়ঙ্গপথে নিয়ে অগ্রসর হলো। রহমান লক্ষ্য করলো, অনুচরগণ ভিতরে প্রবেশ করে একটা শিকলের মত কিছু ধরে টান দিলো, সঙ্গে সঙ্গে সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ হয়ে ঠিক পূর্বের আকার ধারণ করলো।

রহমানের কপাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো, তখনও চোখেমুখে রক্তের ধারা ঝরছে। তবুও ভালভাবে সব সে লক্ষ্য করে চলেছে। সুড়ঙ্গপথটা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলেও মশালের আলোতে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। ঝাঁম জঙ্গলে ভূগর্ভে যে এমন একটা সুড়ঙ্গ আছে, কোনোদিন কেউ জানতো না। জানতো না দস্যু বনহুর বা তার অনুচরগণ। রহমানের ধমনীর রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠেছে। যদিও সে সত্যি সত্যি কিছুটা অসুস্থ বোধ করছিলো।

একটানা বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা কক্ষে নিয়ে তাদের নামানো হলো। পাশাপাশি সবাইকে শুইয়ে দেওয়া হলো মেঝেতে। রহমান তাকিয়ে দেখলো, কক্ষমধ্যে কয়েকজন অনুচরবেষ্ঠিত একজন ভয়ঙ্কর চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে। রহমান বুঝতে পারলো, এ লোকটাই এদের সর্দার হবে। তবে কি এই সেই মঙ্গল ডাকু? লোকটার ভীষণ চেহারা দেখে তাই মনে হচ্ছে। রহমান ঠিক অনুচরদের অনুকরণে ভান করে উঃ আঃ করতে লাগলো।

পাশাপাশি আহত এবং নিহত অনুচরদের মেঝেতে শুইয়ে দেওয়ার পর সেই ভয়ঙ্কর চেহারার লোকটি ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জে উঠলো। বললো— এতোগুলো লোক প্রাণ দিয়েছো, আর ওদের ক'জনকে হত্যা করতে পেরেছো তোমরা?

নিহত আর আহত লোকগুলোর পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো অন্যান্য অনুচর। মঙ্গল ডাকুর কথায় কারো মুখে কথা সরলো না, পুনরায় মঙ্গল ডাকু গর্জন করে উঠলো—নরাধম, তোমরা এতোগুলো প্রাণ দিলে আর তাদের একজনকেও হত্যা করতে পারলে না?

অনুচরদের মধ্য হতে একজন ভয়কম্পিত কণ্ঠে বললো—হুজুর আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিলাম, কারণ তখন আমরা পূজার মন্ত্র উচ্চারণে ব্যস্ত ছিলাম।

সেকথা অবশ্যই ঠিক, তোমরা প্রস্তুত ছিলে না।

সর্দার এবং তার অনুচরদের মধ্যে যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন রহমান সব মনোযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছিলো।

বলে চললো মঙ্গল ডাকু—তোমরা জানো না হয়তো, যারা আমাদের এতোগুলো লোককে হত্যা করেছে তারা কারা?

অনুচরদের মধ্য হতে একজন বলে উঠলো—হুজুর, আমরা জানতে চাই তারা কারা?

দস্যু বনহুর তার দলবল নিয়ে হামলা করেছিলো, তা ছাড়া আর কার সাধ্য আমার আস্তানায় হানা দেয়। হাঁ, আর একটা সংবাদ তোমরা জানো না, দস্যু বনহুরের একজন অনুচর আমাদের গুপ্তগুহায় প্রবেশ করে ধরা পড়েছে।

অনুচরগণ আনন্দধ্বনি করে উঠে!

অনুচরদের একজন বলে—হুজুর এর পূর্বে আমাদের হাতে দস্যু বনহুরের দু'জন লোক বন্দী হয়েছিলো কিন্তু তাদের নিকট হতে আমরা একটি কথাও বের করতে পারিনি।

হাঁ আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম, তাদের দু'জনকে নির্মম শাস্তি দেওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের সর্দার সম্বন্ধে কোনো কথা জানাতে রাজী হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা প্রাণ দিলো তবু সর্দারের আস্তানার সন্ধান দিলো না।

হুজুর এবার যে ধরা পড়েছে সেও তো তার সর্দারের সম্বন্ধে সব গোপন রাখতে পারে। কাজেই একজনকে হত্যা করে আমরাও কোনো তৃপ্তি পাবো না বা প্রতিশোধও নেওয়া হবে না।

হাঁ, তোমার কথা সত্য; আমাদের এতোগুলো প্রাণের বিনিময়ে দস্যু বনহুরের একজন অনুচরকে হত্যা করে কোনো লাভ হবে না। স্বয়ং দস্যু বনহুরকে যতক্ষণ হত্যা করতে না পারছি আর তার আস্তানা যতক্ষণ সমূলে ধ্বংস করতে সক্ষম না হয়েছি ততক্ষণ কিছুতেই আমার স্বস্তি নেই। তবে মনে হচ্ছে, এই দণ্ডে যাকে আমরা বন্দী করতে পেরেছি তার দ্বারাই আমরা দস্যু বনহুরের সন্ধানলাভে সক্ষম হবো।

হুজুর, দস্যু বনহুরের লোকরা অত্যন্ত ধূর্ত; তারা জীবন দেয় তবু সর্দারের খোঁজ দেয় না।

এ কথার প্রমাণ আমরা কালই পাবো। যাকে আমরা বন্দী করেছি সে পূর্বের দু'জনের মত ভীতু ধরনের লোক নয়। এর কথায় বোঝা যায়, দস্যু বনহুরের সন্ধান আমাদের কাছে জানাতে তার আপত্তি নেই।

আবার অনুচরদের মধ্যে আনন্দসূচক শব্দ শুনা যায়।

মঙ্গল ডাকু আদেশ দেয়—এবার তোমরা নিহতদের মধ্য হতে আহতদের বেছে বের করে নাও। নিহতদের লাশ গুমগর্তে নিক্ষেপ করো, আহতদের জন্য ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করো।

সঙ্গে সঙ্গে অনুচরগণ নিহতদের মধ্য হতে আহতদের দেহ বেছে বের করে নিলো। নিহতদের লাশ গুমগর্তে নিক্ষেপ করার জন্য কাঁধে তুলে নিলো আহতদের এক একটা খাটিয়ায় শুইয়ে দেওয়া হলো।

মঙ্গল ডাকু বেরিয়ে গেলো সেই কক্ষ হতে।

মঙ্গল ডাকু বেরিয়ে যেতেই অন্যান্য অনুচর বেরিয়ে গেলো সে কক্ষ হতে। মাত্র দু'জন রইলো আহতদের সেবা-যত্নের জন্য। অনুচরদ্বয় আহতদের দেহের ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগিয়ে বেঁধে দিতে লাগলো এবং যারা 'জল, জল' বলে আর্তনাদ করছিলো তাদের জলপান করাতে লাগলো।

অন্যান্য আহতের সঙ্গে রহমানকেও জলপান করালো ওরা এবং তার ললাটের ক্ষতেও ঔষধ লাগিয়ে দিলো। রহমান পানি পান করে অনেকটা সুস্থ এবং সবল হয়ে উঠলো। এখন সে প্রতীক্ষা করতে লাগলো সুযোগের। বুঝতে তার বাকী নেই—তাদের সর্দার এখন মঙ্গল ডাকুর আস্তানায় মঙ্গল ডাকু হস্তে বন্দী রয়েছে।

❑

গভীর রাত।

আহত অনুচরগণ সবাই এখন গভীর নিদ্রায় অচেতন।

শুধু রহমানের চোখে ঘুম নেই, সে অতি সন্তর্পণে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলো। ভূগর্ভ আস্তানা বলে মঙ্গল ডাকু তার সুড়ঙ্গ পথে কোনো পাহারার ব্যবস্থা করেনি বা রাখা প্রয়োজন মনে করেনি।

কক্ষটা নিস্তব্ধ।

মাঝে মাঝে আহত অনুচরদের গোঙানির ক্ষীণ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ তখন শোনা যাচ্ছিলো না। রহমান সতর্কতার সংগে শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো, তারপর বেরিয়ে গেলো অতি সাবধানে।

রহমান কক্ষ থেকে বেরিয়ে যখন অগ্রসর হচ্ছিলো তখন সে আশ্চর্য হলো, মঙ্গল ডাকু তার আস্তানা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত, কাজেই কোথাও কোনোরকম পাহারা নেই। স্বচ্ছন্দভাবেই এগিয়ে চললো রহমান, বিস্ময় নিয়ে দেখতে লাগলো মঙ্গল ডাকুর অদ্ভুত গুপ্তগুহাটা। ভূগর্ভে এতোবড় গুহা দস্যু বনহুরের ছাড়া আর কারো থাকতে পারে, ভাবতেও পারেনি রহমান। দেয়ালটা উঁচুনীচু জমকালো পাথর দিয়ে তৈরি। মাঝে মাঝে গর্ত আছে, তারই মধ্যে মশাল গোঁজা রয়েছে।

রাত গভীর, তাই মশালের আলোগুলো জ্বলে জ্বলে এখন প্রায় নিভু নিভু হয়ে এসেছে। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

রহমান জানে না, কোন্ গুহায় তার সর্দার দস্যু বনহুর বন্দী রয়েছে। এখনও রহমানের মাথায় পট্টি বাধা, ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত চুপসে উঠছে, পট্টিটা রক্তের ছোপে রাঙা হয়ে উঠেছে। দিশেহারার মত সে সর্দারের

অন্বেষণ করে ফিরছে গুহার মধ্যে। হঠাৎ যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াবে তা জানে রহমান, কিন্তু কোনো উপায় নেই—জীবন দিয়েও তাকে সর্দারের অন্বেষণ করতে হবে।

হঠাৎ একটা গুহায় প্রবেশ করতেই চমকে উঠে রহমান, সংগে সংগে মুখ ফিরিয়ে নেয়—এটা সেই গুহা যে গুহায় প্রবেশ করে বনহুর হাত দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে ফেলেছিলো। কতগুলো নারীকে সম্পূর্ণ উলংগ অবস্থায় হাত-পা শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কেউ বয়স্ক, কেউ বা তরুণী, কেউ বা মধ্যবয়সী—নানারকম নারীই আছে এখানে। পিশাচ শয়তান মঙ্গল ডাকু কাউকে ক্ষমা করেনি।

রহমান দ্বিতীয় বার গুহার মধ্যে তাকাতে পারলো না, সে যে পথে প্রবেশ করেছিলো সে পথে বেরিয়ে এলো, বুঝতে তার বাকী রইলো না—এ মঙ্গল ডাকুর পৈশাচিক কীর্তি।

এবার রহমান আরও উদগ্রীবভাবে অন্বেষণ করে চললো। হঠাৎ সম্মুখে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়ালো, আধো অন্ধকারে স্পষ্ট দেখলো একটা নারকীয় দৃশ্য—কতগুলো উলংগ, অর্ধ-উলংগ নিদ্রারত নারী-দেহের মধ্যে শায়িত একটি ভীষণ আকার মানুষ। রহমান ভালভাবে লক্ষ্য করতেই দেখলো, এ লোকটিই তখন অনুচরদের আদেশ দিচ্ছিলো, 'আহতদের মধ্য হতে নিহত ব্যক্তিদের বেছে গুমগর্তে নিক্ষেপ করে দাও'। এ লোকটিই এদের সর্দার বা দলপতি তাতে সন্দেহ নেই এবং এ লোকই মঙ্গল ডাকু। রহমানের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠলো, ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত হলো তার। রহমানও দস্যু— লুটতরাজ আর হত্যা করা তারও নেশা কিন্তু জঘন্য মনোবৃত্তি তার নয়। অবশ্য এ শিক্ষা তার সর্দারের—নেতা যদি উচ্ছৃঙ্খল, বদমাইশ আর লম্পট হয় তাহলে তার অনুচর বা সহচরগণও তেমনি হবে। দস্যু বনহুর ডাকাত, তবু সে জঘন্য কাজ থেকে সব সময় বিরত থাকে, কাজেই তার অনুচরগণ কোনোদিনই কুমনোবৃত্তিসম্পন্ন হতে পারে না।

রহমান এই মূল্যবান সময় নষ্ট করলো না, সে দ্রুত বিভিন্ন গুহাগুলো অনুসন্ধান করে চললো। অল্পক্ষণেই পেয়ে গেলো তার অন্বেষিত গুহাটি। স্থির হয়ে দাঁড়ালো রহমান ক্ষণিকের জন্য, দেখলো তার প্রিয় সর্দারকে হাত-পা লৌহশিকলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং লৌহশিকলগুলো দেয়ালে মজবুত বালার সংগে আটকানো। শুধু সর্দার নয়, আরও বহু লোককে এভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে। জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার কতগুলো মানুষ পড়ে আছে মেঝেতে; সকলের হাত-পায়ে শিকল বাঁধা। তারা বেঁচে আছে না মরে গেছে বোঝা মুস্কিল।

বনহুরকে এমনভাবে দেয়ালের সংগে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে যাতে সে বসতে বা শুতে না পারে বনহুর কখন যে কাঁধের উপর মাথাটা কাৎ করে ঝিমিয়ে পড়েছে তার খেয়াল নেই।

রহমান চাপা স্বরে ডাকে—সর্দার!

চির পরিচিত স্বর, মুহূর্তে তন্দ্রা ছুটে যায় বনহুরের, সজাগ দৃষ্টি মেলে তাকাতেই চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠে, বলে—রহমান তুমি?

সর্দার, আপনার এ অবস্থা? রহমান বনহুরের হাতখানা মুক্ত করার চেষ্টা করে।

বনহুর বলে—রহমান, তুমি এভাবে.....

সর্দার, পরে সব জানতে পারবেন, কি করে আপনাকে মুক্ত করবো এখন সে পরামর্শ দিন?

তুমি কি তাহলে এই সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশের পথ আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছ রহমান?

হাঁ সর্দার, হয়েছি।

শোন, ঐ যে একটি তাক দেখছো ওখানেই চাবি আছে। সবচেয়ে বড় চাবি দুটো নিয়ে এসো, ঐ দুটো চাবি দ্বারা আমার হাত এবং পায়ের তালা খুলে ফেলো।

রহমান বনহুরের কথা অনুযায়ী কাজ করলো, ও পাশের তাকের উপর অনেকগুলো চাবি সাজানো আছে তার মধ্য হতে বড় চাবি দুটো বেছে নিয়ে ফিরে এলো বনহুরের পাশে, দ্রুতহস্তে খুলে ফেললো বনহুরের হাত এবং পায়ের শিকলের তালা।

বনহুরের হাত-পা বন্ধনমুক্ত হওয়ায় সে নিজের দেহের অন্যান্য বন্ধন মুক্ত করে নিলো তারপর বন্দীদের নিকটে এসে চাপা স্বরে বললো—বন্ধু, তোমরা আর কয়েক দিন কষ্ট করো, আমি তোমাদের মুক্ত করে নেয়ার জন্য অচিরেই আবার আসছি! কথাটা বলে রহমানের সংগে বনহুর বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে।

বনহুরকে রহমান যখন মুক্ত করে দিচ্ছিলো তখন বন্দিগণ লক্ষ্য করলেও তারা কোনোরকম প্রতিবাদ করলো না, কারণ তারা বন্দী অবস্থায় মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করছিলো; তাদের মধ্য হতে কেউ যদি পালিয়ে প্রাণ বাঁচায় বাঁচুক। তাছাড়াও বনহুরের দেব চেহারা বন্দীদের মনে একটা মায়ার সঞ্চার করেছিলো, তাই কেউ কোনোরকম সাড়াশব্দ করলো না।

বনহুর রহমানের সংগে বেরিয়ে এলো সুড়ঙ্গমধ্য হতে শিবমন্দির মধ্যে, তারপর মন্দিরের বাইরে।

বনহুর রহমানকে বুকে জড়িয়ে ধরলো—রহমান, তুমি আমার সহচরই শুধু নও—আমার বন্ধু।

রহমান আবেগভরা কণ্ঠে বললো—সর্দার!

হাঁ, চলো এখানে বিলম্ব করা আর মোটেই ঠিক নয়।

❑

রহমান?

সর্দার?

আজ ক'দিন হলো আমি ঝাঁম জংগল ত্যাগ করে কান্দাই ফিরে এসেছি, কিন্তু এতটুকু সময়ের জন্য মনে শান্তি পাচ্ছি না। যতক্ষণ না ঝাঁম জংগলে মঙ্গল ডাকুর কবল থেকে সেই নির্যাতিত আমার ভাই এবং বোনদের মুক্ত করে আনতে সক্ষম না হয়েছি ততদিন আমি স্বস্তি পাবো না। বনহুর তার বিশ্রামকক্ষের মেঝেতে পায়চারিরত অবস্থায় কথাগুলো বলে শয্যার পাশে বসে পড়লো।

রহমান দাঁড়িয়ে ছিলো বনহুরের অদূরে, সরে এলো কয়েক পা, ঠিক শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালো—সর্দার, আমাদের লোকজন এবং অস্ত্রশস্ত্র সব প্রস্তুত। আপনার আদেশের অপেক্ষামাত্র।

বনহুর শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় বালিশে ঠেস দিয়ে বসে বললো—আর বেশি বিলম্ব করা চলবে না, অচিরেই আমরা ঝাঁম জংগল আক্রমণে যাত্রা করবো।

সর্দার?

বলো রহমান?

ঝাঁম জংগল আক্রমণে যাওয়ার পূর্বে একবার বৌরাণীর সংগে দেখা করা.....

হাঁ, একবার তার সংগে দেখা করা আমার কর্তব্য। নূরীও আছে সেখানে, কাজেই....কথা শেষ না করে চুপ হলো বনহুর।

রহমান কোনো কথা বললো না, কিন্তু বনহুরের কথা বলার ভাব দেখে একটু মুষড়ে পড়লো, সর্দারকে সে এমন ব্যথাকরুণভাবে কোনোদিন কথা বলতে দেখেনি। রহমান বললো—সর্দার, আপনি যদি আদেশ করেন তবে আমরা দলবল নিয়ে ঝাঁম জংগলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারি।

আর আমি?

আপনি বিশ্রাম করুন।

হেসে উঠলো বনহুর—বিশ্রাম করবো আমি?

সর্দার, আপনার শরীর ভাল মনে হচ্ছে না, কাজেই......

কে বললো আমার শরীর ভাল নয়? রহমান, তুমি আগামী পরশু ঝাঁম জংগল আক্রমণে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও। আমি আজ রাতেই কান্দাই শহরে রওয়ানা দেবো।

আজকে তৈরি করার জন্য নির্দেশ দেবো সর্দার?

হাঁ, তাই দাও।

সর্দার?

বলো?

কেশব এখন থেকে কাঁদাকাটা শুরু করেছে।

কেন?

আপনার ঝাঁম জঙ্গলে যাত্রার কথা শুনে।

এত ভীতুজনকে আস্তানায় রাখা যায় না রহমান।

এমন সময় কোথা হতে কেশব ছুটে এসে বনহুরের পায়ের কাছে বসে পড়ে—আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না বাবু, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না.......

গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর—পারবে অস্ত্রচালনা করতে? পারবে ঘোড়ায় চড়তে? পারবে মানুষ হত্যা করতে?

সব পারবো কিন্তু মানুষ হত্যা করতে পারবো না।

ধরো কেউ যদি তোমার সামনে তোমার ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয় কিংবা তোমার মায়ের বুক থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে গলা টিপে মেরে ফেলে? বলো তবু পারবে না সেই মানুষনামী পাপিষ্ঠকে হত্যা করতে?

পারবো। একশোবার পারবো! আমার ভাইয়ের বুকে যে ছুরি বসিয়ে দেবে তাকে আমি শুধু হত্যাই নয়, তার দেহের চামড়া ছাড়িয়ে দেহে লবণ মাখিয়ে হত্যা করবো। যে আমার মায়ের বুক থেকে সন্তান কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলবে তাকে আমি জীবন্ত কবর দেবো......

বনহুর কেশবকে বুকে জড়িয়ে ধরে—সাবাস! কেশব, এই যে দেশবাসী জনগণ—এরা কি তোমার ভাই নয়?

হাঁ বাবু, এরা আমার ভাই, বিশ্বজননীর সন্তান—সবাই আমরা ভাই ভাই।

তবে আর কেন কেশব, এসো হাত মিলাও আমার সংগে, শপথ করো—ভাই হয়ে ভাইদের জন্য জীবন দিতে দ্বিধা করবে না?

কেশব বনহুরের প্রশস্ত হাতখানার উপর হাত রাখলো—বাবু আমি শপথ করছি, আজ থেকে......চুপ হয়ে গেলো কেশব।

বনহুর বিপুল আগ্রহ নিয়ে বললো—বলো কেশব, থামলে কেন? বলো বিশ্বজননীর নির্যাতিত সন্তানদের জন্য তুমি জীবন বিলিয়ে দেবে?

কেশব আবিষ্টের মত উচ্চারণ করে চললো—বিশ্বজননীর নির্যাতিত সন্তানদের জন্য আমি নিজ জীবন বিলিয়ে দেবো।

বনহুরের হাতের উপরে হাত রেখে কথাগুলো বললো কেশব।

রহমান উচ্চারণ করলো—খোদা হাফেজ।

বনহুরের চোখ দুটো তখনও কেশবের চোখে স্থির হয়ে আছে। বললো বনহুর—কেশব, আজ থেকে তুমি বাইরের লোক নও। দস্যু বনহুরের একজন অনুচর।

কেশব মাথা নত করলো।

রহমান বললো—চলো কেশব, শিক্ষাগারে চলো, তোমাকে আমাদের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেওয়া হবে।

রহমান আর কেশব বেরিয়ে গেলো।

বনহুর শয্যা গ্রহণ করলো।

কিন্তু বেশিক্ষণ শয্যায় শয়ন করে থাকতে পারলো না, উঠে এসে দাঁড়ালো টেবিলের পাশে। জমকালো ড্রেসে সজ্জিত হয়ে নিলো—মাথায় পাগড়ী, কোমরের বেল্টে রিভলভার—বেরিয়ে এলো বনহুর আস্তানার বাইরে। তাজের পাশে এসে দাঁড়াতেই তাজ সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে লাগলো। তাজের এটা অভ্যাস—বনহুর তার পাশে এলে সে মনের আনন্দ এভাবেই প্রকাশ করতো।

তাজ প্রভুকে পিঠে পাবার জন্য সদা উন্মুখ।

বনহুর উঠে বসলো তাজের পিঠে, তারপর ছুটে চললো কান্দাই শহর অভিমুখে।

উল্কা বেগে তাজ ছুটে চললো।

শহরে পৌঁছতে কয়েক ঘন্টা লেগে গেলো। অতি সন্তর্পণে শহরের নির্জন পথ ধরে বনহুর চৌধুরী বাড়ির পিছনে এসে যখন পৌঁছলো তখন রাত গভীর।

সমস্ত শহরটার সংগে চৌধুরী বাড়িও ঝিমিয়ে পড়েছে। চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ, গেটের পাহারাদারটাও টুলে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্ছে।

বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো, বাগানবাড়ির প্রাচীর টপকে প্রবেশ করলো ভিতরে। অদূরেই ঝি-চাকরদের কক্ষগুলো বাগানবাড়ির দিকেই ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মরিয়ম বেগম।

এরই একটি কক্ষে থাকে নূরী, বনহুর আলগোছে নূরীর কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়ায়, মৃদু টোকা দেয় দরজায়। একবার, দুবার, তিনবার—না, ভিতর থেকে কোনোরকম সাড়া পাওয়া যায় না। বনহুর দরজায় আস্তে হাত

রাখতেই খুয়ে যায় দরজাটা। ভিতরে ডিমলাইট জ্বলছে। বনহুর কক্ষমধ্যে তাকিয়ে দেখে নূরীর শয্যা শূন্য, নূরী কক্ষে নেই।

বনহুরের মুখে চিন্তার ছাপ পড়লো, নূরী গেলো কোথায়? এতোরাতে নূরী নিজ কক্ষ ত্যাগ করে কোথায় থাকতে পারে? বিমর্ষ মনে বনহুর মনিরার কক্ষের পিছনে এসে দাঁড়ালো, তারপর পাইপ বেয়ে উঠে গেলো উপরে। দরজা অর্ধ ভেজানো ছিলো, বনহুর কক্ষে প্রবেশ করলো, সংগে সংগে থমকে দাঁড়ালো বনহুর—দেখলো মনিরার শিয়রে বসে নূরী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

বনহুরকে দেখে মনিরা এবং নূরী উভয়ে সোজা হয়ে বসলো। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাদের। মনিরার চোখে ঘুম আসছিলো না, তাই সে নূরীকে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে নিচ্ছিলো, যদি একটু ঘুম পায়।

নূরীর আচরণে মনিরা মুগ্ধ—ওকে ওর বড় ভাল লাগে। তাই সে যখন তখন নূরীকে ডেকে পাশে নিয়ে গল্প করে, মাথায় হাত বুলিয়ে নেয়। তাছাড়া যখন খারাপ লাগে তখন নূরীর নাচ ওর প্রিয়। এ নাচ দেখতে গিয়েই মনিরা একদিন আত্মহারা হয়ে নিজের গলার লকেটসহ চেন মালাটা ভুল করে দিয়েছিলো নূরীকে যার জন্য বনহুর খুঁজে পেয়েছিলো মনিরাকে। আজও মনিরার চোখে যখন ঘুম আসছিলো না তখন নূরীকে সে ডেকে পাঠিয়েছিলো নিজ ঘরে, বলেছিলো—ফুল, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেনা, দেখি যদি ঘুম পায়।

নূরী মৃদু হেঁসে বলেছিলো—আপামণি, কেন আপনার চোখে ঘুম আসে না?

তুই বুঝবি না ফুল। বলেছিলো মনিরা।

ফুল হেসেছিলো মনে মনে, বলেছিলো—আমরা গরীব সাঁপুড়ে মেয়ে, আপনারা বড়লোক মানুষ, তাই আপনাদের কথা আমরা বুঝবো কি করে।

রাগ করলি ফুল?

না আপামণি। মনিরার কপাল টিপে দিতে দিতে বলেছিলো নূরী।

মনিরা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেছিলো, একটু আগে—ফুল, পুরুষজাতটা বড় বেঈমান, তাই না রে?

নূরী মাথা নীচু করেছিলো, কোনো জবাব দেয়নি, কারণ সে জানে, মনিরা কাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলছে। যাকে উদ্দেশ্য করে মনিরা বলছে, তাকে নূরী কোনোদিন বেঈমান বলতে পারে না। নূরীর কাছে সে যে চির মহান—বেঈমান সে নয়।

কিরে, চুপ করে রইলি কেন? বুঝেছি, বিয়ে তো করিসনি, এখনও তাই পুরুষদের সম্বন্ধে বুঝবি কি করে!

নূরী এ কথাতেও কোনো জবাব দেয়নি, নীরবে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে।

বনহুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে মনিরার পাশে নূরীকে দেখে খুশিই হলো।

মনিরা যদি তখন লক্ষ্য করতো তাহলে বুঝতে পারতো, বনহুরের আগমনে শুধু তার চোখে মুখেই খুশির উৎস বয়ে যায়নি, তার পরিচারিকা ফুলের মুখমণ্ডলেও ফুটে উঠেছে এক স্বর্গীয় দীপ্তভাব।

বনহুরের সংগে নূরীর দৃষ্টি বিনিময় হলো, অভিনন্দন জানালো নূরী দৃষ্টির মাধ্যমে।

মনিরা শয্যা ত্যাগ করে আনন্দোচ্ছ্বাসিত স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালো, হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরে বললো—এসেছো?

নূরী সেই মুহূর্তে বনহুর আর মনিরার পাশ কেটে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা রেখে বললো—বড্ড দেরী করলে?

এক সঙ্কটপূর্ণ ভয়াবহ অবস্থায় পড়েছিলাম মনিরা, তাই আসতে পারিনি ক'দিন। তারপর শয্যার দিকে তাকিয়ে বললো—নূর কোথায়, মনি?

ভয় নেই, নূর আজকাল মামীমার ঘরে শোয়, কারণ সে এখন বুঝতে শিখেছে। বলে হাসে মনিরা।

বনহুর মনিরার চিবুকে মৃদু চাপ দিয়ে বলে—অতি বুদ্ধিমতী তুমি! তারপর উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শয্যার কাছে ফিরে আসে বনহুর। মাথার পাগড়ীটা খুলে রাখে টেবিলে।

মনিরা বনহুরের কোমর থেকে রিভলভারসহ বেল্টখানা খুলে নেয়, তারপর রেখে দেয় পাগড়ীটার পাশে।

বনহুর শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় হেলান দিয়ে বসে, মনিরাকে টেনে নেয় কাছে, ওর কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলে—ফুলকে নিয়ে এতোরাতে কি গল্প হচ্ছিলো শুনি?

ঘুম পাচ্ছিলো না তাই মাথায় হাত বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। জানো মেয়েটা বড় ভালো, যেমন অমায়িক তেমনি সরল। মামীমার দক্ষিণ হাত হয়ে পড়েছে। আমারও সাথী, যখন ভাল লাগে না ওকে নিয়ে গল্প করি, গান শুনি, নাচ দেখি। খুব সুন্দর গান গাইতে পারে, নাচতে পারে চমৎকার। নূর প্রথমে ওর কাছে যেতেই চাইতো না, এখন ফুল বলতে পাগল!

মনিরার কথায় বনহুর স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে, যাক নূরীর সম্বন্ধে সে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলো, কারণ নূরী জংলী মেয়ে—কখন কি বিভ্রাট ঘটিয়ে বসবে কে জানে! মনিরা যখন নূরীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তখন বনহুরের হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বাসে ভরে উঠছিলো—নূরী যে ভদ্রসমাজে এসে সভ্য মানুষের মত

চলাফেরা করতে পারবে, এ কথা সে ভাবতে পারেনি। আশঙ্কা ছিলো মনে, সে ভয় আজ নিঃশেষে মুছে গেলো মন থেকে, বললো বনহুর—মেয়েটি বড় অসহায়, তোমাদের স্নেহ আর মায়া দিয়ে ওকে আপন করে নিয়েছো শুনে আমি অনেক খুশি হলাম।

একদিন ওর নাচ দেখাবো তোমাকে।

আমার সামনে নাচতে চাইবে কি?

তোমাকে লুকিয়ে রাখবো আড়ালে, ফুল নাচবে আমার সম্মুখে, তুমি দেখবে।

হাসলো বনহুর, কোনো জবাব দিলো না।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো এতোক্ষণ নূরী, এবার সে মৃদু হেসে চলে গেলো সেখান থেকে। নিজের ঘরে প্রবেশ করে বিছানায় গা ঢেলে দিলো।

❑

ঘুমিয়ে পড়েছে মনিরা।

ধীরে ধীরে উঠে বসলো বনহুর, মনিরার হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতখানা বের করে নিয়ে আলগোছে নেমে দাঁড়ায় শয্যা থেকে। টেবিলের উপর থেকে রিভলভাসহ বেল্টখানা তুলে নিলো তারপর কোমরে বেল্ট এঁটে পাগড়ীটা পড়ে নিলো মাথায়, সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো কক্ষ থেকে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে।

ঐ সময় ঝি আলীর মার ঘুম ভেংগে গিয়েছিলো, সিড়িতে বুটের চাপা শব্দ শুনে জানালার পাশে উঁকি দিলো, চমকে উঠলো—জমকালো পোশাক পরা একটি লোক নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে, ভয় আর বিস্ময় নিয়ে আলীর মা দেখতে লাগলো। সিড়ির বাতিতে সে সব স্পস্ট দেখতে পাচ্ছে।

বনহুর লঘু পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালো নূরীর কক্ষের দরজায়।

আলীর মার চোখ ছানাবড়া হলো, কি ব্যাপার দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইলো সে।

বনহুর আঙ্গুল দিয়ে মৃদু টোকা দিচ্ছে তখন।

দরজা খুলে গেলো।

বনহুর প্রবেশ করলো কক্ষমধ্যে।

নূরী দরজা বন্ধ করে দিলো।

আলীর মা'র ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো, সে বেরিয়ে এলো বাইরে—আস্তে এসে দাঁড়ালো নূরীর কক্ষের দরজায়। ভিতর থেকে ভেসে আসছে নূরীর হাসির

শব্দ, তার সংগে পুরুষের গলার আওয়াজ। আলীর মার মুখ হা হয়ে গেছে, যে ফুলকে তারা খুব ভাল মেয়ে বলে জানে সে ফুল চরিত্রহীনা মেয়ে? ঘৃণায় নাক তার কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। কান পেতে শুনতে লাগলো আলীর মা।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলো, তারপর পা ঠিপে টিপে উঠে গেলো উপরে, মরিয়ম বেগমের কক্ষের দরজায় এসে ধীরে ধীরে ডাকতে লাগলো বিবি সাহেব, বিবি সাহেব, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন......

মরিয়ম বেগমের ঘুম ভেংগে গেলো, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে আলীর মাকে দেখে বিস্মিত হলেন, বললেন—কি হয়েছে আলীর মা?

ঠোঁটের উপর আংগুল চাপ দিলো আলীর মা—চুপ। চলুন ভিতরে, সব বলছি।

মরিয়ম বেগম আলীর মাকে কক্ষে প্রবেশ করার জন্য পথ ছেড়ে দিলেন।

আলীর মা কক্ষে প্রবেশ করে বললো—বিবি সাহেব, তাজ্জব ব্যাপার!

কি হয়েছে বল্ না?

মাগো, সেকি কাণ্ড—একটা ভূতের মত কালো পোশাক পরা মানুষ সিঁড়ি বেয়ে উপর থেকে নেমে গেলো.....

বলিস কি আলীর মা?

আগে সব শোনো বিবি সাহেব......বেশি উত্তেজিত হলে আলীর মায়ের কোনো হুশ-জ্ঞান থাকতো না, সে কার সংগে তুমি বা আপনি বলছে সে কথাও মনে হতো না।

বললো আলীর মা—কালো লোকটার মাথায় পাগড়ী, কোমরে বাঁধা পিস্তল, যেন ডাকাতের মত চেহারা.......

বলিস কি আলীর মা, ডাকাত এসেছিলো আমার বাড়িতে?

ঠিক বলতে পারছি না বিবি সাহেব, আমার মনে হয় ডাকাতই হবে।

কি সর্বনেশে কথা বলছিস আলীর মা, ডাকতে পারলি না দারওয়ানকে।

ডাকবো কি, সে লোকটা সিড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে, আমি ভয়ে কাঁপছি, দেখি লোকটা সোজা ফুল ঝির ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। ওমা কি অবাক কাণ্ড, ফুল ঝির দরজায় টোকা দিতে লাগলো লোকটা।

তারপর?

কি বলবো বিবি সাহেব, ফুল ঝিকে আমরা খুব ভাল মেয়ে বলে জানি কিন্তু তার মধ্যে এতো......

কি হলো বল্ না?

বলছি তো, লোকটা টোকা দিতেই দরজা খুলে দিলো ফুল ঝি, যেন সে লোকটার জন্য পথ চেয়ে ছিলো। দরজা খুলে দিতেই লোকটা ঢুকে পড়লো ভিতরে।

বলিস কি আলীর মা? মরিয়ম বেগমের চোখেমুখে অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠলো, তিনি বললেন পুনরায়—মিথ্যা কথা বলছিস তুই।

আগে সব শোনো, আমি একটি কথাও মিথ্যা বলছি না। লোকটা ঘরে ঢুকতেই আমি দরজায় এসে ওৎ পাতলাম। ওমা, সেকি বিশ্রী কাণ্ড, ছিঃ ছিঃ ঘেন্নায় আমি বাঁচি না—ঘরের ভিতর থেকে ভেসে আসতে লাগলো ফুলের হাসির শব্দ, পুরুষের গলাও শোনা যাচ্ছিলো। মাগো আমি যেন শরমে মরে গেলাম একেবারে......

মরিয়ম বেগম রাগত কণ্ঠে বললেন—ফুল তেমন মেয়েই নয়। তুই ভুল করছিস আলীর মা।

এই চোখে হাত দিয়ে কসম কাটছি, পশ্চিম দিকে মুখ করে বলছি, একবর্ণ আমি মিথ্যা বলছি না।

মরিয়ম বেগম যেন বিবর্ণ হয়ে উঠলেন, কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না আর।

আলীর মা এবার জোর গলায় বললো—দাঁড়িয়ে আছো কেন বিবি সাহেবা, দেখবে চলো।

মরিয়ম বেগম কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না—কে ঐ লোক, চোর না ডাকাত। ফুলের ঘরে সে প্রবেশ করে হাসি-তামাসা করছে—এ কেমন কথা! বললেন মরিয়ম বেগম—সরকার সাহেব নিচে ঘুমিয়ে আছেন তাকে ডাক দিয়ে বল্‌গে, যা।

আলীর মা আর দাঁড়ায় না। সে প্রথমে দারওয়ানকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দেয়—এই, বাড়িতে চোর এসেছে আর তুই নাক ডেকে ঘুমুচ্ছিস্ হতভাগা......

আলীর মার ধাক্কা খেয়ে ধড়মড় করে জেগে উঠে পশ্চিমা দারওয়ান, বলে কিয়া হুয়া আলী মাই'?

হয়েছে আমার মাথা। বাড়িতে চোর এসেছে আর নবাব নাক ডেকে ঘুমাচ্ছো।

চোর? কাঁহা চোর?

ঐ ফুলকা ঘরমে দেখো গিয়ে.....

ফুলকা ঘরমে!

হাঁ, যাও শীগগির, আমি সরকার সাহেবকে জাগাতে যাচ্ছি।

আলীর মা যখন শোর-হাঙ্গামা করে দারওয়ানকে জাগাতে চেষ্টা করছিলো, বনহুর তখন নূরীর ঘরে বসে সব শুনছিলো—বেরিয়ে আসে বনহুর নূরীর কাছে বিদায় নিয়ে। আলীর মা তখন সরকার সাহেবের ঘরের

দিকে এগুচ্ছিলো, বনহুর অন্ধকারে তার পথ আগলে দাঁড়ালো এবং সংগে সংগে খপ করে টিপে ধরলো তার গলাটা। অমন চেঁচামেচি করছো কেন?

ভয়ে গোংগাতে লাগলো আলীর মা—এ্যাঁ এ্যাঁ কে—কে—কে তুমি.......

বনহুর যখন আলীর মার টুটি টিপে ধরেছে তখন দারওয়ান চীৎকার শুরু করে দিয়েছে—চোর.....চোর.....চোর.......

গভীর রাতে দারওয়ানের চীৎকার শুনে চৌধুরী বাড়ির সবাই জেগে উঠলো।

বনহুর শুনতে পেলো চারদিকে দ্রুত পদশব্দ। এই দণ্ডে সে আর বিলম্ব করা সমীচীন মনে করলো না। আলীর মায়ের গলা মুক্ত করে দিয়ে অন্ধকারে আত্মগোপন করলো, পরক্ষণেই বাগানবাড়ির পিছনে শোনা গেলো অশ্ব পদশব্দ খট খট খট।

আলীর মা তখনও গলায় হাত বুলিয়ে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করছে, মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে বিবর্ণ। গলায় চাপ পড়ায় চোখ দুটো লালে লাল হয়ে উঠেছে—আর একটু, তাহলেই আলীর মার চোখমুখে রক্ত বেরিয়ে পড়তো।

সরকার সাহেব এবং অন্যান্য কর্মচারী সবাই এসে ঘিরে ধরলো আলীর মাকে। ততক্ষণে মরিয়ম বেগমও এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। সকলেরই চোখেমুখে একটা আতঙ্কভরা ভাব ফুটে উঠেছে। সবাই বলছে কি হলো, কি হলো—কোথায় চোর, কোথায় চোর......

শোরগোল শুনে মনিরার ঘুম ভেংগে গিয়েছিলো, জেগেই সে চমকে উঠলো, পাশে স্বামীকে না দেখতে পেয়ে বিমর্ষ হলো। বুঝতে পারলো, সে পালিয়েছে। পরক্ষণেই কানে গেলো দারওয়ানের চীৎকারের শব্দ—চোর.....চোর....চোর.....

মনিরা মনে করলো, ঠিকই তার স্বামীকে ওরা চলে যেতে দেখেছে, তাই চীৎকার করছে।

মনিরাও নিচে নেমে এলো, দেখলো সবাই জটলা করে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আলীর মাকে। আলীর মা গলায় হাত বুলিয়ে রোদন করছে, ভয়ে তার মুখ ছাই-এর মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

বললো মনিরা—কি হয়েছে মামীমা? হঠাৎ নজর পড়লো ওদিকে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে ফুল।

মরিয়ম বেগম কিছু বলবার পূর্বেই বলে উঠলো আলীর মা—আপামণি, চোর নয়, ডাকাত—ডাকাত এসেছিলো। আর একটু হলে আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতো। ওরে বাবা, হাত দু'খানা যেন লোহার সাঁড়াশী......

মনিরা বলে আবার—কি হয়েছে? ডাকাত তোর গলা টিপে ধরেছিলো নাকি?

হাঁ, আপামণি, তোমাকে কি বলবো—সেকি ভীষণ চেহারা, জমকালো পোশাক পরা, কোমরে পিস্তল, মাথায় হেইয়া বড় পাগড়ী.......

আলীর মার বলার ভংগী দেখে মনে মনে হাসছিলো মনিরা, বললো—ঠিক তবে ডাকাতই হবে! তা তুই ধরতে পারলি না?

ধরবো আমি! বাবাঃ কি শক্তি তার গায়ে, গলাটা আমার গেছে—একবার আড়চোখে নূরীর দিকে তাকিয়ে বললো আলীর মা—চলো আপামণি, ঘরে গিয়ে সব বললো তোমায়।

মনিরা আলীর মাকে সংগে করে ফিরে এলো নিজের ঘরে।

❑

আলীর মার মুখে সব শুনে মনিরার মুখ কালো হয়ে উঠলো, চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠলো তার। বললো—আলীর মা, সত্যি তুমি সেই কালো পোশাক পরা লোকটাকে ফুলের ঘরে প্রবেশ করতে দেখেছিলে?

হন্তদন্ত হয়ে বললো আলীর মা—ছিঃ ছিঃ ছিঃ আমি মিথ্যা কথা বলবো! আমি নিজের চোখে দেখেছি—শুধু দেখিনি, ঘরের মধ্যে মেয়ে আর পুরুষের হাসির শব্দও শুনেছি......

মনিরা ক্রুদ্ধ সিংহীর ন্যায় গর্জে উঠলো—মনে রেখো, যদি এ কথার একটা বর্ণ মিথ্যা হয় তাহলে তোমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে।

কেন আপামণি আমাকে অবিশ্বাস করছেন, ফুলকে আপনি যত ভাল মেয়ে বলেই মনে করেন আসলে সে মোটেই ভাল নয়। কোথাকার কে—চোর না ডাকাত, তার সঙ্গে রাত দুপুরে প্রেম করা.....

আলীর মা, আমি নিজের কানে শুনবো, ডেকে আনো এক্ষুণি ফুলকে।

আচ্ছা তাই শোনো, যদি একবর্ণ মিথ্যা হয় তবে আমাকে বাড়ি-ছাড়া করবে বলেছো তাই করো। বেরিয়ে যায় আলীর মা।

মনিরা মাথার চুল টেনে ছিড়তে থাকে, তবে কি তার স্বামীর সঙ্গে ফুলের.....না না, তার স্বামী কোনো দিন অসৎ চরিত্র লোক নয়, তার সমতুল্য মানুষ হয় না। কত দিনের কত কথা মনে পড়লো, মনে পড়লো বিয়ের পূর্বের কথা—যখন মনিরের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় ঘটেছিলো, কতদিন এক সঙ্গে মিশেছে কিন্তু কই কোনো দিন সে তো তাকে কোনো রকম কুৎসিত অসঙ্গত কথা বলতে শোনেনি বা কোনো মন্দ আচরণ

করেনি। কতবড় সৎ ব্যক্তি হলে সে এমন হয় জানে মনিরা। নিজের স্বামীকে সে ভালভাবেই জানে......

মনিরার চিন্তাজালে বাধা পড়ে, কক্ষে প্রবেশ করে আলীর মা—পেছনে নূরী। নূরীর মুখে গভীর চিন্তার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কতকটা অপরাধীর মতও লাগছে তাকে। নূরী হঠাৎ এমন একটা অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না, সে ভাবতেও পারেনি—আজ বনহুর তার কক্ষে প্রবেশ করতে গিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলবে। যদিও বনহুরকে সে স্বামী বলে গ্রহণ করেছে যখন সে নিজেকে নারী বলে জানতে শিখেছে তখন থেকেই। প্রকাশ্যে তাদের বিয়ে হয়নি। লৌকিকতাপূর্ণ বিয়ে যাকে বলে সেটা না হলেও তারা উভয়ে উভয়কে খোদা সাক্ষী রেখে বিয়ে করেছে। তাদের বিয়ের কথা জানে বন-জঙ্গল, বনের পশু-পাখি, আকাশ-বাতাস আর জানে একজন—সে হলো রহমান। তবু কেন তার মনে দুর্বলতা? কেন সে ভীত হরিণীর মত চকিতভাবে প্রবেশ করলো মনিরার কক্ষে।

মনিরা আলীর মা আর নূরীকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তীব্র চাহনীতে নূরীকে দেখে নিয়ে বললো—ফুল, আমি যা জিজ্ঞাসা করবো সঠিক জবাব দেবে কিন্তু?

চোখ দুটো একবার মনিরার মুখে স্থির হয়ে পুণরায় নত হলো, মুখে কোনো জবাব দিলো না।

মনিরার মুখ কঠিন গম্ভীর।

কিছুক্ষণ পূর্বেই যে মনিরা তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলো এখন যেন সে মনিরা আর নেই। মনিরার ক্রুদ্ধ চেহারা নূরীর মনে ভয়ের উদ্বেগ সৃষ্টি করলো।

মনিরা আলীর মাকে বললো—আলীর মা, তুমি যাও।

বেরিয়ে গেলো আলীর মা, মনিরার রুদ্রমূর্তি দেখে সে আর কোনো কথা বলতে পারলো না বা সাহসই হলো না।

আলীর মা বেরিয়ে যেতেই মনিরা ফুলকে লক্ষ্য করে বললো —ফুল, আজ রাতে তোমার ঘরে কে এসেছিলো?

ফুল নীরব।

মনিরা কঠিন কণ্ঠে বলে—বলো কে এসেছিলো?

তবু মাথা নীচু করে রইলো নূরী।

মনিরা পুণরায় পূর্বের মত রাগতকণ্ঠে বললো—জবাব দিচ্ছো না কেন? বলো কে এসেছিলো আজ রাতে?

এবার নূরী চোখ তুললো, পরক্ষণেই দৃষ্টি নত করে নিলো সে। ঠোঁট দু'খানা কেঁপে উঠলো মাত্র।

মনিরার সমস্ত দেহ রাগে কাঁপছে যেন, নূরীর নীরবতা তার দেহে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারছে—আলীর মা মিথ্যা বলেনি। সত্যি কি তাহলে তার স্বামীর সঙ্গে এই সাঁপুড়ে মেয়েটার কোনো ঘনিষ্ঠতা আছে। আবার বললো মনিরা—তুমি যখন আমার ঘরে ছিলে তখন দেখেছিলে আমার স্বামী এসেছিলো?

হাঁ দেখেছিলাম। এতোক্ষণে একটা কথা উচ্চারণ করলো নূরী।

বললো আবার মনিরা—আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে জানতাম কিন্তু এতোটা জানতাম না। জবাব দাও, সে একটু পূর্বে তোমার কক্ষে কেন গিয়েছিলো?

জানি না।

জানো না, সে তোমার ঘরে গেলো অথচ তুমি জানো না?

না।

তুমি তাহলে অস্বীকার করতে চাও আমার স্বামী তোমার ঘরে যায়নি?

হাঁ গিয়েছিলো।

যুশ।

নূরী মনিরার পায়ের উপর উবু হয়ে বসে পড়ে দু'হাতে ওর পা দু'খানা চেপে ধরে—আমাকে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবেন না আপামণি।

মনিরা পা সরিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো—তোমাকে বলতে হবে সব কথা, নাহলে আমি তোমায় রেহাই দেবো না।

আপামণি। নূরী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো।

মনিরা বললো জানতাম তুমি সচ্চরিত্রা মেয়ে কিন্তু---

না না, আপনার পায়ে পড়ি আপামণি, আমাকে মাফ করে দিন, আমাকে মাফ করে দিন---

লজ্জা করে না তোমার মাফ চাইতে? আমার স্বামীর চরিত্রকে তুমি বিনষ্ট করেছো। আমি তোমাকে মাফ করবো—একথা তুমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলে?

আপামণি---

না, কোনো কথা তোমার শুনতে চাই না, তুমি এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি।

নূরীর কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে যেন, একটি কথাও তার গলা দিয়ে বের হলো না। নীরবে রোদন করতে লাগলো, তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুধারা।

মনিরা তখন কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারছে না। দাঁতে অধর দংশন করে রক্ত বের করে ফেলছিলো। সে ভাবতে পারছে না, তার স্বামী

অন্য একটি নারীর গৃহে প্রবেশ করতে পারে কোনো কু'মতলব নিয়ে। এ কখনও হতে পারে না, কিছুতেই না। গর্জে উঠে মনিরা—যাও বেরিয়ে যাও। রাত ভোর হবার আগেই তোমাকে এ বাড়ি ত্যাগ করতে হবে।

নূরী এবার বললো—আপামণি, একবার নূরকে দেখবো।

হবে না। তোমার ঐ অপবিত্র চোখ দিয়ে আমার নূরকে দেখতে দেবো না। যাও, আর কেউ জানার পূর্বে তুমি চলে যাও।

নূরী আঁচলে চোখ মুছে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো, তারপর ফিরে গেলো নিজের কক্ষে। বালিশে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ কাঁদলো সে, আজ রাতেই তাকে এ বাড়ি ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে সে, রাতের অন্ধকারে কে তাকে পথ বলে দেবে।

তবু যেতে হবে, কক্ষমধ্যে সবকিছু পড়ে রইলো, রিক্ত হস্তে রাস্তায় বেরিয়ে এলো নূরী। রাতের অন্ধকারে পথ চলতে লাগলো দিশেহারার মত।

তারা-ভরা আকাশ।

নিস্তব্ধ পৃথিবী, পথের দু'পাশে জোনাকীর আলোগুলো পিট্ পিট্ করে জ্বলছে। আর জ্বলছে ইলেকট্রিক লাইট পোষ্টের আলোগুলো এক একটা ধ্রুবতারার মত।

জোনাকীর আলোগুলো লাইট পোষ্টের আলোতে কেমন বিবর্ণ ম্লান দেখাচ্ছে।

নির্জন পথ বেয়ে চলেছে নূরী।

❑

শহরে বড় একটা আসেনি নূরী, বিশেষ করে কান্দাই শহরে। এসব পথঘাট তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জেগে'উঠলো ঘুমন্ত নগরী। কর্ম-কোলাহলমুখর হয়ে উঠলো রাজপথগুলো। অসংখ্য গাড়ীঘোড়ার ছুটোছুটি আর পথচারীদের ভিড়ে নূরী যেন দিশেহারা হয়ে পড়লো। কোথায় যাবে, কি করবে, ভেবে পাচ্ছিলো না—হাতে একটি পয়সাও নেই যে কোনো গাড়িতে চেপে চলবে।

নূরী ঘোড়ায় চাপতে জানে; একটা ঘোড়া পেলেও সে চেষ্টা করে দেখতো আস্তানার কোনো সন্ধান করতে পারে কিনা। কিন্তু সে আশা দূরূহ—কোথায় পাবে সে ঘোড়া।

ক্ষুধা—পিপাসায় কাতর হয়ে উঠলো সে। বেলা যতই বাড়ছে ততই পা দু'খানা যেন অবশ শিথিল হয়ে আসছে। সম্মুখে একটা হোটেল দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো নূরী, হোটেলের ভিতরে খানাপিনা চলছে। নূরী

দরজায় উঠো দাঁড়ালো, লোলুপ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো যারা টেবিলের চারপাশ ঘিরে খাবার খাচ্ছে তাদের দিকে।

দারওয়ান বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছিলো, নূরীকে দেখে খেকিয়ে উঠে-- ভাগ·,······ হিঁয়াসে।

নূরী তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো কথা বলে না।

দারওয়ান পুনরায় কঠিন কণ্ঠে ধমক দেয়—তুম কেয়া মাঙ্গতে? হিঁয়া ভিক নাহি হোগা, যাও।

নূরী এবার বলে—আমাকে একটু ভিতরে যেতে দাও না।

আন্দরে মে যায়েগা?

হাঁ, আমাকে যেতে দাও, খাবো।

দারওয়ান ওকে পথমুক্ত করে দিলো।

নূরী ভিতরে প্রবেশ করে একটা টেবিলের পাশে গিয়ে বসে পড়লো, চারদিকে অগণিত লোকজন খাবার খাচ্ছে, হাসিগল্পে হোটেল-কক্ষ সরগরম হয়ে উঠেছে। নূরীকে তেমন করে কেউ লক্ষ্য করলো না।

বয় এসে নূরীর সম্মুখে খাবারের প্লেট রেখে গেলো, মাংস আর চপও দিলো। খাবার শেষ হলে বললো—কফি না চা দেবো?

নূরী বললো—ওসব লাগবে না।

বয় মিষ্টি সুপারীর সঙ্গে বিল দিলো নূরীর সম্মুখে।

নূরী বললো—আমি তো পড়তে জানি না।

বয় বললো—দু'টাকা আট আনা হয়েছে।

নূরী অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—দু'টাকা আট আনা।

হাঁ, দিয়ে চলে যান।

কিন্তু আমার কাছে তো পয়সা নেই।

সেকি! বয়ের চোখেমুখে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়লো, এর পূর্বে সে এমন উক্তি কোনোদিন শোনেনি। আজ আট বছর সে এই হোটেলে কাজ করছে। বয় এবার মালিককে জানালো—স্যার, ঐ মেয়েটি দু'টাকা আট আনার খাবার খেয়েছে কিন্তু এখন বলছে তার কাছে কোনো পয়সা নেই।

মালিক তাকালো নূরীর দিকে; এতোক্ষণ সে নূরীকে লক্ষ্যই করেনি, অমন কত মেয়ে-পুরুষ তার হোটেলে অবিরত খাচ্ছে; কখন এসব খেয়াল করবে—হিসাবের খাতা নিয়ে সে বসে থাকে সম্মুখের টেবিলে।

নূরীকে লক্ষ্য করে লোকটা উঠে দাঁড়ালো, এগিয়ে এলো তার পাশে— পয়সা নেই তবে খাবার খেলে কেন? কঠিন কণ্ঠে বললো সে কথাটা।

নূরী অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকালো, কোনো কথা বললো না।

মালিক এবার ধমকে উঠলো—কি, কথা বলছো না যে?

আমার কাছে পয়সা নেই তো!
তবে খেলে কেন?
ক্ষিদে পেয়েছিলো তাই---
তাই পযসা না দিয়েই খাবে?
হাঁ খাবো।
মালিক ধরে ফেললো নূরীকে খপ করে—তোমাকে আটকে রাখবো যতক্ষণ টাকা পরিশোধ না করেছো ততক্ষণ ছেড়ে দেবো না।
নূরী এক ঝটকায় মালিকের হাতের মুঠা থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, রাগে ফোঁস ফোঁস করছে সে।
মালিক ইংগিত করতেই তার হোটেলের কয়েকজন কর্মচারী তাকে পুনরায় ধরে ফেললো।
নূরী কামড়ে—ছিড়ে সে এক ভীষণ কাণ্ড শুরু করে দিলো, টেবিল থেকে প্লেট-গ্লাস-কাপ ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলো মেঝেতে। পাকা মেঝেতে কাঁচের বাসনপত্র পড়ে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেতে লাগলো।
হোটেলের লোকজন সবাই ছুটে এলো চারপাশ থেকে। ভিড় জমে গেলো নূরীর চারপাশে।
এমন সময় ভিড়ের ভিতর থেকে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলো—নূরীর সৌন্দর্য তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। লোকটা পকেট থেকে দশটা টাকা বের করে মালিকের হাতে গুঁজে দিলো—এই নাও, ওকে ছেড়ে দাও তোমরা।
মালিক টাকা পেয়ে নূরীকে মুক্তি দিলো।
নূরী কৃতজ্ঞতাপুর্ণ নয়নে তাকালো সেই লোকটার দিকে।
লোকটা নূরীর পাশে এসে বললো—তুমি কোথায় যাবে?
নূরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো, কোনো উত্তর দিলো না।
বললো লোকটা—এসো তোমাকে পৌঁছে দেবো। এসো।
নূরী লোকটিকে অনুসরণ করলো।
ভদ্রলোক নূরীকে নিয়ে রাস্তায় থেমে থাকা একটি গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো, গাড়ির দরজা খুলে ধরে বললো—উঠো।
নূরীর এখন এমন অবস্থা তার ভাববার শক্তিও যেন লোপ পেয়ে গেছে। কি করবে, কোথায় যাবে—দিশেহারার মত নূরী উঠে বসলো গাড়ির মধ্যে।
ভদ্রলোকটা ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।
কান্দাই শহরের পথ বেয়ে গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

নূরী জানে না কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কেমন লোক এ ভদ্রমানুষটি। কেনই বা তাকে নিয়ে যাচ্ছে সে, কি-ই বা তার উদ্দেশ্য। নিশ্চুপ পুতুলের মত বসে আছে নূরী বাইরের দিকে তাকিয়ে।

একটা বাড়ির সম্মুখে এসে গাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়লো। ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে পিছন আসনের দরজা খুলে ধরলো—এসো।

নূরী মোহগ্রস্তের মত গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো।

ভদ্রলোকটি যখন নূরীকে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছিলো তখন নূরী কোনো কিছু চিন্তা না করে তার সঙ্গে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো। ভাবলো, যাক বিপদকালে একটা আশ্রয় তবু পেলো সে। নিশ্চয়ই এ বাড়িতে ভদ্রলোকটির স্ত্রী পুত্র-কন্যা আছে। তাদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নেবে সে কোনো রকমে, তারপর খুঁজে বের করে নেবে তার বনহুরকে।

লোকটার সঙ্গে নূরী অন্দর বাড়িতে প্রবেশ করতেই গাটা তার ছমছম করে উঠলো। বাড়িতে কোনো মেয়েমানুষের চিহ্ন নেই। ঘরের মধ্যে টেবিলে ছড়িয়ে আছে অনেকগুলো মদের বোতল আর খালি গেলাস। দেয়ালে উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ নারী মুর্তি। মেঝেতে দামী কার্পেট বিছানো, কিন্তু কার্পেটের উপরে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে কয়েকটা নুপুর সেট।

মনে মনে শিউরে উঠলো নূরী, ভয়াতুর দৃষ্টি নিয়ে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো সে।

লোকটি নূরীর দিকে লক্ষ্য করে বললো—আজ থেকে তুমি এ বাড়িতেই থাকবে।

নূরীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, বললো—আপনার স্ত্রী-সন্তান—তারা কই?

বললো লোকটি—আরো ছোঃ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার বালাই আমি ভালবাসি না, তাই ওসব নেই।

আপনি একা থাকেন এ বাড়িতে?

হাঁ, আমি ছাড়া এ বাড়িতে আর দু'জন আছে—তারা আমার দেহরক্ষী পাহারাদার।

বাবুর্চি-বয়—এসব?

ওসবও আমি বরদাস্ত করতে পারি না। বয়-বাবুর্চি আমার প্রয়োজন হয় না। গোসল করি লেকে, কাপড় দেই ধোপারবাড়ি, খাই হোটেলে, বিশ্রাম করি বাসায়। দেখো তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, বলো কি নাম তোমার?

কিছুক্ষণ পূর্বেই হোটেলে লোকটা যখন তার খাবারের টাকা পরিশোধ করে দিয়েছিলো তখন নূরীর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিলো। আর এখন সেই কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে তার সমস্ত শরীর ঘৃণায় রি রি করে উঠলো। নূরী বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা নূরীর পথ রোধ করে দাঁড়ালো—যাবে কোথায়?

না, আমাকে যেতে দিন।

যাবে, কিন্তু আমার টাকা?

নূরীর মুখ চুণ হয়ে গেলো, কোথায় পাবে সে টাকা। এক্ষণে তার পেটের মধ্যের খাবারগুলো যেন কাঁটার মত খচ্ খচ্ করতে লাগলো, নিরুপায় কণ্ঠে বললো—টাকা আমার কাছে নেই জেনেই আপনি টাকা দিয়েছিলেন।

সে কারণেই তো তোমায় আমি এনেছি।

কি চান আপনি আমার কাছে?

তোমার রূপসুধা পান করতে চাই সুন্দরী। হাত ধরে ফেলে নূরীর।

কি বললে শয়তান? এক ঝটকায় হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ভীষণ জোরে একটা চড় বসিয়ে দেয় সে লোকটার গালে।

লোকটা চড় খেয়ে আরও ভীষণ হয়ে উঠে, জোর করে ধরে ফেলে নূরীকে।

নূরী কামড়ে ধরে দাঁত দিয়ে লোকটার হাতখানা।

নূরীর ধারালো দাঁত কেটে বসে যায় লোকটার হাতে—রক্ত গড়িয়ে পড়ে, যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠে, সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করে দেয় সে নূরীকে।

নূরী মুহূর্ত বিলম্ব করে না, টেবিল থেকে একটা বোতল তুলে ছুঁড়ে মারে লোকটার মাথা লক্ষ্য করে।

লোকটা তখন কেবল সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, নূরীর নিক্ষিপ্ত বোতলটা গিয়ে লাগে তার মাথায়।

মদের ভারী বোতলটা ওর মাথায় লেগে ভীষণভাবে কেটে যায় ওর মাথাটা, গড় গড় করে রক্তধারা বেরিয়ে আসে কপাল বেয়ে, চোখমুখ রক্তে লাল টকটকে হয়ে উঠে।

নূরীর দিকে এগোয় লোকটা বিকৃত চেহারা নিয়ে, ভয়ঙ্কর নর পিশাচের মত আক্রমণ করে সে ওকে।

নূরী হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে উন্মাদিনীর মত হয়ে উঠে। সে মেঝে থেকে ভাঙ্গা বোতলটা তুলে নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে লোকটাকে। চোখেমুখে আঘাতের পর আঘাত করে চলে।

লোকটা পড়ে যায় মেঝেতে, যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। নূরী তখনও ওর চোখেমুখে ভাঙ্গা বোতলটা দিয়ে অবিরত খোঁচা দিয়ে চলেছে।

অল্পক্ষণেই মারা পড়ে লোকটা।
নূরী তখনও আঘাত করে চলেছে। এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে দু'জন লোক। হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করে এই অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে যায়—কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য, পরক্ষণেই লোক দুটো নূরীকে ধরে ফেলে।
নূরী তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত অসাড় হয়ে পড়েছে যেন, পালানোর কথা সে ভুলেই গিয়েছিলো। লোক দু'জন যখন এসে পড়েছে তখন নূরীর হাতে শয়তানটার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে।
নূরীকে বন্দী করে পুলিশে খবর দিলো লোক দু'জন।
অল্পক্ষণেই পুলিশ এসে পড়লো।
খুনের দায়ে গ্রেফতার করা হলো নূরীকে।
নূরীর হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ ভ্যানে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো পুলিশ অফিসে। নূরীর কোনো কথাই তারা শুনলো না। হাজতে নিয়ে বন্দী করে রাখা হলো তাকে।

❑

নূরীকে যখন হাজতে কারারুদ্ধ করা হলো তখন কান্দাই জঙ্গলে বনহুর তৈরি হচ্ছে ঝাঁম জঙ্গল আক্রমণে যাত্রার জন্য। অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা-বারুদ নিয়ে প্রস্তুত সবাই। সকলের দেহেই জমকালো ড্রেস, পিঠে রাইফেল বাঁধা, কোমরের বেল্টে রিভলভার আর সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা।
বনহুর যখন অন্যান্য অনুচরকে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণের জন্য অপেক্ষা করছে তখন রহমান নাসরিনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।
আজ ক'দিন থেকে নাসরিন রহমানের উপর অভিমান করে বসে আছে, একটি বার কথাও বলেনি সে তার সঙ্গে। নাসরিন যেদিন জানতে পেরেছে, ঝাঁম জঙ্গলে মঙ্গল ডাকুর আস্তানা আক্রমণে যাবে ওরা সেদিন থেকে তার মনে দুশ্চিন্তার ঝড় উঠেছে। আশঙ্কা হচ্ছে, যদি কোনো বিপদ ঘটে তাহলে কি হবে। হয়তো এই তাদের শেষ দেখা হবে। নাসরিন শুধু স্বামী রহমানের জন্যই চিন্তিত নয়, তাদের সরদার বনহুরের জন্যও অত্যন্ত ভাবিত। রহমানের মুখে সব শুনেছিলো, জানতে পেরেছিলো মঙ্গল ডাকুর আস্তানার সব ঘটনা। কত বড় নৃশংস ভয়ঙ্কর এই মঙ্গল ডাকু সেকথা জেনে শিউরে উঠেছিলো সে। রহমানকে বলেছিলো—তোমাদের সরদারকে ক্ষান্ত করো; মঙ্গল ডাকু যা খুশি করুক তাতে তোমাদের কি? সে তো তোমাদের কোনো অমঙ্গল করছে না।

রহমান বলেছিলো—বলো কি নাসরিন, মঙ্গল ডাকু আমাদের কোনো অমঙ্গল করেনি বলতে চাও? আমাদের দু'জনকে বন্দী করে সে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

তোমরাও দু'জনার পরিবর্তে মঙ্গল ডাকুর কতগুলোকে হত্যা করেছো, সে কথা ভুলে যেও না।

কিন্তু তুমি তো জানো নাসরিন, কি অমানুষ এই মঙ্গল ডাকু—সব তোমাকে বলেছি। মঙ্গল ডাকু শত শত অবলা নারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে সে উলঙ্গ অবস্থায় বন্দী করে রেখেছে। কাউকে সে রেহাই দেয়নি তার কুৎসিত মনোবৃত্তি থেকে।

উঃ কি মর্মস্পর্শী কথা। এসব তুমি স্বচক্ষে দেখেছো?

সব আমি নিজের চোখে দেখেছি—অমানুষিক বীভৎস কাণ্ড। বলো নাসরিন, এরপরেও তুমি আমাদের ক্ষান্ত হতে বলো?

না, যাও যাও তোমরা জয়ী হয়ে ফিরে এসো এই কামনা করি।

রহমান নাসরিনের মুখখানা তুলে ধরলো—নাসরিন।

বলো?

যদি ফিরে না আসি?

তোমায় ক্ষমা করবো।

নাসরিন, তুমি বীর জায়ার মতই জবাব দিয়েছো।

যাও আর বিলম্ব করো না, সরদার হয়তো ক্ষুন্ন হবেন।

হাঁ যাচ্ছি।

রহমান নাসরিনের দক্ষিণ হস্তখানা উঁচু করে চুম্বন করলো, তারপর বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে।

ফিরে এলো রহমান দলবলের পাশে যেখানে তারই জন্য অপেক্ষা করছে সরদার স্বয়ং এবং অন্যান্য অনুচর।

বনহুর বুঝতে পারলো, রহমান নাসরিনের কাছে বিদায় নিতে গিয়েছিলো, কাজেই সে কোনোরকম প্রশ্ন তাকে করলো না, কেন তার বিলম্ব হলো।

আজ কেশবও তাদের সঙ্গী হয়েছে।

যদিও বনহুর তাকে বার বার বারণ করেছিলো।

কেশব অশ্বপৃষ্ঠে চড়া জানতো না কিন্তু সে এখন অশ্বে-চাপা, অস্ত্র-চালনা, সব ভালভাবে শিখে নিয়েছে। বনহুর অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসতেই অন্যান্যের সঙ্গে কেশবও চেপে বসলো অশ্বপৃষ্ঠে।

দস্যু বনহুরের আস্তানা প্রকম্পিত হয়ে উঠলো অশ্ব-পদশব্দে।

তীর বেগে ছুটে চলেছে অশ্বগুলো।

যুদ্ধযাত্রার মতই সবাই বীরদর্পে অগ্রসর হচ্ছে। বনহুর আর রহমান সর্বাগ্রে।

বনহুর তাজের পিঠে।

আর রহমান দুলকীর পিঠে। জমকালো রং তাজের আর দুলকীর রং মেটে ধরনের। রাতের অন্ধকারে মিশে গেছে যেন এ দুটি অশ্ব। অন্যান্য অশ্ব কালো তবে কোনোটা লালচে, কোনোটা ধলাটে আর কোনোটা গাঢ় কালো।

এক সঙ্গে এতোগুলো অশ্বের পদধ্বনিতে চারদিক যেন থরথর করে কেঁপে উঠছে।

মঙ্গল ডাকুর আস্তানায় পৌঁছে গেলো এক সময় দস্যু বনহুরের দল। তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। মঙ্গল ডাকুর শিব মন্দিরের নিকটে এসে নেমে পড়লো সবাই অশ্বপৃষ্ঠ থেকে।

বনহুর অনুচরদের অশ্ব ত্যাগ করে তাকে এবং রহমানকে অনুসরণ করতে বললো।

বনহুর আর রহমান সর্বাগ্রে এগুচ্ছে।

বনহুরের হাতে রিভলভার, রহমানের হাতে রাইফেল। রহমানই শিবলিঙ্গটাকে একপাশে টেনে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গমুখ।

প্রথমে সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলো বনহুর স্বয়ং, তার হাতে উদ্যত রিভলভার। পর পর অন্যান্য সকলে প্রবেশ করতে লাগলো—সবশেষে রহমানও প্রবেশ করলো সুড়ঙ্গমধ্যে। আশ্চর্য হলো সবাই—সুড়ঙ্গমুখে কোনো পাহারা নেই। কিছুদূর এগুতেই কানে এলো মঙ্গল ডাকুর গলার আওয়াজ।

বনহুর সবাইকে সন্তর্পণে আত্মগোপন করতে আদেশ দিলো, যে মুহূর্তে বনহুর শীস দিবে সবাই যেন বেরিয়ে আসে।

বনহুরের নির্দেশ অনুযায়ী সুড়ঙ্গমধ্যে যে যেখানে পারলো লুকিয়ে পড়লো।

সম্মুখে এগিয়ে চললো বনহুর আর রহমান।

উভয়ের হাতে উদ্যত আগ্নেয় অস্ত্র।

এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে মঙ্গল ডাকুর কণ্ঠস্বর—আমাদের ঝাঁম আস্তানার সন্ধান তারা জেনে গেছে, কাজেই এখানে আর বিলম্ব করা আমাদের মোটেই উচিত হবে না। তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও, এখান থেকে সরে পড়তে হবে।

হুজুর, আমরা সব প্রস্তুত হয়ে রয়েছি, শুধু আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করছি। এটা অন্য একটা গলার স্বর বলে মনে হলো।

বনহুর আর রহমান ধৈর্যসহকারে কান পেতে শুনতে লাগলো। পুনরায় ভেসে এলো সরদার মঙ্গল ডাকুর গলার আওয়াজ—বন্দী এবং বন্দিনীদের বেঁধে গোপন পথ দিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো।

বন্দী আর বন্দিনীদের হাত-পা'র শিকল খুলে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকের কোমরে রশি বেঁধে একসঙ্গে গেঁথে নেওয়া হচ্ছে। হুজুর, আপনি একবার দেখবেন চলুন।

যাচ্ছি, তোমরা যাও।

হুজুর, আমাদের ধনভাণ্ডার কিভাবে নেওয়া হবে?

সে ব্যবস্থা আমি নিজে করবো।

আচ্ছা হুজুর। কতগুলো পদশব্দ শোনা গেলো।

হয়তো বা সে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো অনুচরগণ।

বনহুর ইংগিত করলো রহমানকে, পরক্ষণেই ঝাপিয়ে পড়লো কক্ষমধ্যে।

মঙ্গল ডাকু বনহুর আর রহমানকে দেখে হকচকিয়ে গেলো না, সে যেন এমন একটা অবস্থার জন্য তৈরিই ছিলো। বনহুর আর রহমানকে লক্ষ্য করে মঙ্গল ডাকু একটা গোল বেলুনের মত কিছু ছুঁড়ে মারলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা ধুম্রকুণ্ডলী ছড়িয়ে পড়লো কক্ষমধ্যে।

বনহুর আর রহমান আর কিচ্ছু দেখতে পেলো না, সব যেন ঘোলাটে হয়ে এলো তাদের চোখে।

বনহুর তাড়াতাড়ি নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বললো—রহমান, শীগগির নাকে রুমাল চাপা দাও----

রহমান নাকে রুমাল চাপা দেওয়ার পূর্বেই ঢলে পড়লো মেঝেতে।

বনহুর দ্রুত বেরিয়ে এলো কক্ষমধ্য হতে এবং শীস দিলো সে অত্যন্ত জোরে।

বনহুরের শীসের ইংগিতপূর্ণ শব্দ শোনামাত্র তার অনুচরগণ যে যেখানে আত্মগোপন করে ছিলো সব বেরিয়ে এলো। বনহুর বললো—তোমরা দ্রুত সবাইকে বন্দী করে ফেলো, কেউ যেন পালাতে না পারে।

মুহূর্তে সবাই ছড়িয়ে পড়লো 'কাট কাট, মার মার' শব্দে ভরে উঠলো চারদিক। অস্ত্রের ঝন ঝন শব্দ আর তীব্র আর্তনাদ এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হলো মঙ্গল ডাকুর আস্তানায়।

মঙ্গল ডাকুর অনুচর আর দস্যু বনহুরের অনুচর মিলে শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ।

বনহুর পুনরায় প্রবেশ করলো সেই কক্ষে যে কক্ষ থেকে একটু পূর্বে সে বেরিয়ে এসেছিলো গ্যাসের ধোয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে। এখন সে কক্ষের ধোয়া কমে গেছে। রহমান সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। বনহুর কক্ষমধ্যে

দ্রুত অন্বেষণ করে চললো, কিন্তু মঙ্গল ডাকু কোথায়? শূন্য কক্ষ পড়ে আছে—মঙ্গল ডাকুর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কর্পূরের মত উবে গেছে যেন সে।

রহমানকে কাঁধে তুলে নিলো বনহুর তারপর কক্ষের বাইরে এনে শুইয়ে দিলো। একজন অনুচরকে পাহারায় রেখে বনহুর ছুটে গেলো মঙ্গল ডাকুর সন্ধানে। এদিক সেদিক থেকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতে লাগলো বনহুরকে মঙ্গল ডাকুর অনুচরগণ। বনহুর তাদের পাল্টা জবাব দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলো, অন্বেষণ করতে লাগলো মঙ্গল ডাকুর—কিন্তু আশ্চর্য, মঙ্গল ডাকুর সন্ধান আর পাওয়া গেলো না।

সম্পূর্ণভাবে লোকটা যেন হাওয়ায় মিশে গেছে। যেদিকে তাকাচ্ছে সেদিকেই শুধু আহত আর নিহত দেহ পড়ে আছে, রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে মঙ্গল ডাকুর ভূগর্ভ আস্তানা, যেন রক্তের স্রোত বইছে।

নিহত আর আহতদের মধ্যে উভয় পক্ষের লোকই আছে, তবে মঙ্গল ডাকুর অনুচরগণই নিহত হয়েছে বেশি। দস্যু বনহুর স্বয়ং নিহত করেছে মঙ্গল ডাকুর অনুচরদের। কলাগাছ কাটার মতই হত্যা করেছে সে এদের।

কিন্তু মঙ্গল ডাকু কোথায়? তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অল্পক্ষণেই সমস্ত আস্তানা এক ধ্বংসলীলায় পরিণত হলো। মঙ্গল ডাকুর অনুচরদের মধ্যে কেউ জীবিত রইলো না। বনহুর কয়েকজনকে সুড়ঙ্গমুখে পাহারা রেখেছিলো তারা কাউকে বের হতে দিলো না আস্তানার মধ্য থেকে।

হত্যালীলা শেষ করে ক্ষান্ত হলো বনহুর, সমস্ত আস্তানা জুড়ে শুধু তাদের লোক এখন বিদ্যমান। বনহুর বন্দীশালায় এসে দাঁড়ালো। অসংখ্য বন্দীকে সারিবদ্ধ করে বাঁধা হয়েছে। এই মুহূর্তে তাদের অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছিলো। ভাগ্যিস সে দলবল নিয়ে ঠিক সময় এসে পড়েছে, আর একটি দিন বিলম্ব হলেই মঙ্গল ডাকু তার আস্তানা অন্য জায়গায় পাল্টে নিতো। বনহুর বন্দীদের মুক্ত করে দিবার জন্য আদেশ দিলো।

বন্দিগণ বনহুরকে দেখেই খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো, কারণ এই লোকটিই পালিয়ে যাবার দিন তাদের আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলো—তোমরা অপেক্ষা করো, আমি আবার আসবো এবং তোমাদের মুক্তির জন্যেই আসবো।

বনহুর যখন বন্দীদের বন্ধন উন্মোচন করে দিচ্ছিলো তখন তার পাশে তাকে সাহায্য করছিলো কায়েস ও কেশব।

হঠাৎ কেশবের দৃষ্টি চলে যায় ওদিকে একটা দেয়ালের ফাঁকে—একজন ভীষণ চেহারার লোক সুতীক্ষ্ণধার একখানা ছোরা ছুঁড়ে মারলো বনহুরের পিঠ লক্ষ্য করে।

কেশব মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুরকে আড়াল করে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে ছোরাখানা বিদ্ধ হলো কেশবের বুকে।

বনহুর ফিরে তাকালো মুহূর্তে, কেশব তখন ভূতলে লুটিয়ে পড়েছে, রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে তার দেহের বসন। বনহুর চট্ করে বসে পড়লো এবং দ্রুতহস্তে ছোরাখানা টেনে খুলে নিলো কেশবের বুক থেকে।

বনহুরের চোখ দুটো ব্যথা-বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো, কেশবের মাথাটা তুলে নিলো বনহুর কোলে—একি হলো কেশব? কে তোমাকে এভাবে হত্যা করলো?

কেশব জড়িত কণ্ঠে বললো—একটি ভয়ঙ্কর চেহারার লোক ঐ---ওখান থেকে---ছোরা মেরেছে---ঐ ওখান---কথা শেষ করতে পারলো না কেশব, ঘাড় একপাশে কাৎ হয়ে পড়ে।

এমনভাবে আজ কেশবকে হারাতে হবে ভাবতেও পারেনি বনহুর। কায়েস বললো—সরদার, কেশব আপনাকে রক্ষার জন্যই আজ নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলো।

বনহুর বললো—কেশব আমার বন্ধুই শুধু নয়—আমার প্রাণরক্ষক, ওকে হারিয়ে আমি আজ কতবড় বন্ধুকে হারালাম তা বলতে পারবো না।

বেশিক্ষণ দুঃখ করার সময় ছিলো না বনহুরের, কেশবের হীমশীতল মাথাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো সে। চোখ দুটো তার ছলছল করছে, বললো বনহুর—নিশ্চয়ই মঙ্গল ডাকু কেশবকে হত্যা করেছে, কারণ মঙ্গল ডাকুর উদ্দেশ্য ছিলো আমাকে হত্যা করা। কেশব প্রাণ দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে নিলো। কিন্তু আজ আমি শপথ করছি—যতদিন মঙ্গল ডাকুকে এর উপযুক্ত শাস্তি না দিয়েছি ততদিন আমি বিশ্রাম গ্রহণ করবো না। এসো ভাই, তোমরা এসব অসহায় বন্দী ভাই এবং বোনদের উদ্ধার করে নাও। এসো তোমরা।

বনহুর বন্দীদের মুক্ত করে দিয়ে এবার কায়েসসহ প্রবেশ করলো নারীদের বন্দীশালায়। বস্ত্রহীন উলঙ্গ নারীদের দেখেই কায়েস বেরিয়ে যাচ্ছিলো, বনহুর বললো—কায়েস, লজ্জা করলে চলবে না, এদের রক্ষা করতে হবে। এসো দ্রুতহস্তে বন্ধন উন্মোচন করে দাও। বনহুর নিজে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে থাকা ছিন্নভিন্ন ন্যাকড়ার টুকরোগুলো তুলে নিয়ে এক একজন বন্দিনীর দেহে চাপা দিতে লাগলো।

কায়েস বন্ধন উন্মোচন করে চললো।

অপূর্ব-অদ্ভুত এ দৃশ্য—বনহুর মা-বোনদের ইজ্জৎ আবরণে আচ্ছাদিত করে চললো। যেমন করে হোক তাদের উদ্ধার করতেই হবে। আজকের এ

সংগ্রাম তার শুধু মা-বোন আর অসহায় ভাইদের জন্য। নির্মম অকথ্য অত্যাচারের কবল থেকে তাদের বাঁচিয়ে নিতে হবে।

মহিলাদের মুক্ত করে নিয়ে বনহুর আশ্বস্ত হলো। ততক্ষণে রহমানের সংজ্ঞালাভ ঘটেছে। এবার বনহুর সমস্ত বন্দী এবং বন্দিনীসহ নিজ অনুচরদের বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। রহমান কেশবের মৃতদেহটা তুলে নিলো কাঁধে।

সবাই যখন বেরিয়ে এলো বাইরে তখন বনহুর আর কায়েস একটা বোমা বের করে আগুন ধরিয়ে দিলো, তারপর দ্রুত বেরিয়ে এলো তারা। মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে আসতে না আসতে ঝাঁম জঙ্গল প্রকম্পিত করে ভীষণ একটা আওয়াজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর চীৎকার করে বললো— শীগগির সরে পড়ো শীগগির সরে পড়ো।

বনহুরের কথায় সবাই মন্দিরের নিকট হতে দ্রুত সরে যাবার জন্য ছুটতে শুরু করলো।

পিছনে শোনা গেলো গাছপালার সঙ্গে মাটি ধসে পড়ার শব্দ। সেকি ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ,সকলের কান তালা লেগে গেলো।

একটু পড়ে সবাই সজ্ঞানে ফিরে এলো। বনহুর এবার সবাইকে নিয়ে ফিরে চললো ঝাঁম শহরে। ঝাঁম জঙ্গল থেকে কয়েক মাইল দুরে ঝাঁম শহর। বনহুর প্রথমে ঝাঁম শহরে যাওয়াই মনস্থ করলো।

ঝাঁম শহরে বনহুর নিজেকে বিদেশী সওদাগর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলো। শহরের এক প্রান্তে মস্তবড় একটা বাড়ি ভাড়া নিলো এবং সেবাড়িতে মঙ্গল ঠাকুর নিপীড়িত বন্দী ও বন্দিনীদের থাকার ব্যবস্থা করলো।

এবার তাদের খাওয়া-পরা এবং চিকিৎসার প্রয়োজন। বনহুর কায়েস আর দু'জন অনুচরকে রেখে রহমান ও অন্যান্য অনুচরকে কান্দাই ফিরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলো।

রহমান বনহুরের আদেশ অনুযায়ী অনুচরদের নিয়ে ফিরে চললো নিজ আস্তানায়।

কায়েস, মাহমুদ আর সোহরাবকে নিয়ে বনহুর রয়ে গেলো ঝাঁম শহরে। প্রতিটি বন্দী এবং বন্দিনীকে মুক্ত করলেও তাদের নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও তাকেই করতে হবে, নাহলে অসহায় অবস্থায় পথে ধুকে ধুকে মরবে ওরা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এখন চাই প্রচুর অর্থ।

এতোগুলো মানুষকে বাঁচাতে হলে অর্থের প্রয়োজন। বনহুর আস্তানা থেকে এসেছিলো সংগ্রামের জন্য, কাজেই সে টাকা-পয়সা নিয়ে আসেনি।

বনহুর অর্থের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়লো ঝাঁম শহরে।

বনহুর তার আংগুলের হীরক অংগুরীটা বিক্রয় করে টাকা সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো। ভাড়া করা একটা টাঙ্গা গাড়িতে চেপে বসে বললো— একটা স্বর্ণকারের দোকানে নিয়ে চলো।

টাঙ্গাওয়ালা ঝাঁমবাসী, বনহুর তাকে ঝাঁম দেশীয় ভাষায় কথাটা বললো।

টাঙ্গাওয়ালা বললো—লালাসাম! মানে আচ্ছা স্যার।

বনহুর ঠেশ দিয়ে বসে আছে, ঝাঁম শহরে সে কোনোদিন আসেনি, তাই নতুন দেশটাকে নতুন দৃষ্টি নিয়ে বনহুর নির্নিমেষ নয়নে দেখছে।

পথঘাটে অন্যান্য দেশের মত তেমন ভিড় নেই, ঝাঁম অধিবাসীদের সংখ্যা পথে অনেক কম, তবে নারী-পুরুষ উভয়েই ব্যস্তভাবে চলাফেরা করছে।

পথের দু'পাশে অন্যান্য দেশের মত দোকানপাট, হোটেল রয়েছে। মাঝে মাঝে সিনেমা হলও নজরে পড়ে। শহরটা খুব বড় নয়, মাঝারি গোছের।

বনহুর নীরবে বসে চিন্তা করছিলো, তার মনে সদা-সর্বদা উদয় হচ্ছিলো কেশবের কথা। ঝাঁম জঙ্গলে কেশব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। শেষ পর্যন্ত কেশবের মৃতদেহ ফিরে আনবে ভেবেছিলো। কিন্তু সম্ভব হয়নি। ঝাঁম জঙ্গলে তাকে রেখে আসতে হয়েছে। বনহুরের বড় আফসোস নূরীর সঙ্গে তার আর দেখা হলো না। নূরীকে কেশব বোনের মত ভালবাসতো। নূরীও তাকে সমীহ করতো, ভালবাসতো ঠিক বড় ভাই-এর মতো। আহা বেচারী কেশব---

হঠাৎ বনহুরের চিন্তা বিচ্ছিন্ন হয়, টাঙ্গাওয়ালা বলে—সাম্ আসামো। মানে স্যার এসে গেছে।

বনহুর টাঙ্গাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিলে বললো—কামরুদা হুম্‌সো। মানে, টাঙ্গাওয়ালা ধন্যবাদ।

বনহুর টাঙ্গা থেকে নেমে স্বর্ণকারের দোকানে প্রবেশ করলো।

স্বর্ণকার বনহুরের দেহে কালো পোশাক দেখে অবাক হলো। বিশেষ করে তাদের দেশে কালো পোশাক পরা মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। কালো পোশাক পরা ব্যক্তি নাকি এদেশে সবচেয়ে বেশি সম্মানী হয়, তাই তারা বের হয় কম।

বনহুর স্বর্ণকারের দোকানে প্রবেশ করতেই স্বর্ণকার তাকে নত হয়ে অভিনন্দন জানালো।

বনহুর একটু আশ্চর্য হলো।

স্বর্ণকার তার সবচেয়ে বড় আসনটা এগিয়ে দিয়ে ঝাঁম ভাষায় বললো— বসুন স্যার।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো।

স্বর্ণকার নত হয়ে বিনত কণ্ঠে বললো—কি কারণে আগমন আপনার?

বনহুর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঝাঁম ভাষায় উত্তর দিলো, কারণ সে খুব ভাল ঝাঁম ভাষা জানতো না, তবে যতটুকু জানতো তা দিয়েই কাজ চলবে, বললো—একটি অংগুরী বিক্রয়ের জন্য এসেছি।

স্বর্ণকারকে বনহুর নিজ অংগুরী খুলে দেখালো।

স্বর্ণকার অংগুরী হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে বললো—এ অংগুরী আপনি কেন বিক্রয় করবেন?

বললো বনহুর—অর্থের প্রয়োজন।

স্যার, যত অর্থ প্রয়োজন নিয়ে যান আপনি, কিন্তু এ অংগুরী আমরা কিনে নিতে পারি না।

অবাক হয়ে বললো বনহুর—কেন?

কারণ এ অংগুরী ঝিন্দের রাণীর হস্তের প্রতীক।

ঝিন্দের রাণী। চমকে উঠলো বনহুর—তাইতো, এ অংগুরী মনিরা তার আংগুলে একদিন পরিয়ে দিয়েছিলো, যেদিন বনহুর মনিরাকে ঝিন্দ শহর থেকে নৌকাযোগে কান্দাই নিয়ে যাচ্ছিলো। মনিরা একদিন ঝিন্দের রাণী-বেশে ঝিন্দ সিংহাসনে আরোহণ করেছিলো বটে। তাহলে এটা ঝিন্দের রাণীর।

বললো স্বর্ণকার—আপনি ঝাঁম রাজ্যে বাস করেন অথচ ঝাঁমের সঙ্গে ঝিন্দ রাজ্যের সম্বন্ধ কি জানেন না?

না তো? বললো বনহুর।

স্বর্ণকার বললো—ঝাঁম রাজ্যের রাজার বোন হলেন ঝিন্দের রাণী। কাজেই আমাদের রাজ্যে রাজার বোনের সমাদর বা সম্মান ঠিক ভাই-এর মতই। আপনি বুঝি ঝিন্দের রাণীর আত্মীয়?

বনহুর স্থির হয়ে কিছু চিন্তা করলো, তারপর বললো—হাঁ, আমি ঝিন্দ রাণীর আত্মীয়ই বটে।

স্যার, আপনি কত টাকা নেবেন বলুন আমি দিয়ে দিচ্ছি।

না দরকার নেই, আমি ঝাঁম রাজার নিকটেই যাচ্ছি, তাঁর কাছেই নিয়ে নেবো।

স্বর্ণকার তাতে আপত্তি করলো না, বললো—সাম্ এহি লাম্লু—অর্থ হলো, স্যার আপনি ঠিক বলেছেন।

বনহুর স্বর্ণকারের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো।

এবার বনহুর ভাবতে লাগলো, রাজার নিকট হতেই তাকে এ অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

এগিয়ে চললো বনহুর ঝাঁম শহরের পথ ধরে। সম্মুখে একটা উটের গাড়ি দেখে উঠে বসলো—রাজবাড়ি নিয়ে চলো।

বনহুরের দেহে কালো পোশাক দেখে পথচারিগণ তাকে পথ মুক্ত করে দিচ্ছিলো, সবাই নত হয়ে সম্মান দেখাচ্ছিলো তাকে।

বনহুর যখন উটের গাড়িতে উঠে বসলো তখন গাড়ির চালক তাকে সসম্মানে বসার জন্য সহায়তা করলো। মনে মনে বনহুর তার পোশাকটাকে ধন্যবাদ জানালো।

ঝাঁম অধিবাসিগণ সবাই কালো পোশাক পরতে পারতো না, এ পোশাক পরম সম্মানিত পোশাক। বনহুর যখন রাজদরবারে পৌঁছলো তখন তাকে সবাই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে অভিনন্দন জানালো।

বনহুরকে রাজদরবারের মধ্যে রাজার সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হলো।

বনহুরের সৌম্য-সুন্দর দীপ্তময় চেহারা দেখে ঝাঁম রাজা তাকে উঠে সমাদর করে পাশে বসালেন, এবং কোথা থেকে এসেছে জিজ্ঞাসা করলেন।

বনহুর দক্ষিণ হস্তের অংগুরীটা দেখিয়ে বললো—ঝিন্দ রাজ্য থেকে এসেছি।

অংগুরী দেখামাত্র ঝাঁমরাজ বনহুরের দক্ষিণ হস্তখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে পরপর তিনবার চুম্বন করে চললেন। বিস্মিত হলো বনহুর।

ঝাঁম রাজা সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন—রাজ অতিথির জন্য শহরে মহোৎসবের আয়োজন করো। রাজদরবার হতে রাজা স্বয়ং বনহুরকে নিয়ে গেলেন অন্দর মহলে। বাগানবাড়ির বিশ্রামাগারে বনহুরের থাকার সুব্যবস্থা করে দিলেন।

বনহুর বাগানবাড়ির বিশ্রামাগারে প্রবেশ করে অবাক হলো, এ যেন স্বর্গপুরী। সুন্দর দুগ্ধফেননিভ শয্যা। সদ্য ফোটা ফুল দিয়ে সমস্ত কক্ষটা আচ্ছাদিত। দেয়ালে নানারকমের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। টেবিলে স্বর্ণ এবং মণি-মাণিক্য খচিত, ফুলদানীতে মুক্তার ফুল-ঝাড়। উজ্জ্বল আলোতে আলোকিত চারদিক। সবচেয়ে বনহুর বেশি আশ্চর্য হলো, কয়েকটি সুন্দরী নারী কক্ষমধ্যে দণ্ডায়মান।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করতেই সুন্দরী নারীগণ তাকে নত মস্তকে অভিবাদন জানালো।

বনহুরকে বিশ্রামাগারে পৌঁছে দিয়ে ঝাঁমরাজ বেরিয়ে গেলেন দরবার কক্ষে, সেনাপতি আর মন্ত্রীকে বললেন উৎসবের আয়োজন করতে।

বনহুর কক্ষমধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে চারদিকে তাকালো। এক একটি তরুণীর মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলো—তরুণীগুলোর চেহারা সুঠাম, বয়স বিশ বছরের বেশি নয় কারো। মূল্যবান বেশভূষায় সজ্জিত

তারা। মাথার চুলগুলো বেণী করে কাঁধের দু'পাশে ঝুলানো। হাতে-গলায় ফুলের মালা, চোখে কাজল, কপালে সোনার টিপ। ঠোঁটের কোণে মিষ্টি মিষ্টি হাসি।

বনহুর তাকিয়ে দেখছিলো আর ভাবছিলো, ঝাঁম রাজার অতিথি সৎকারের অদ্ভুত আচরণ। তরুণীগুলোকে রাখা হয়েছে অতিথির মনোতুষ্টি কারণে তাতে কোনো ভুল নেই।

বনহুর অবাক হয়ে দেখছে তখন দু'জন তরুণী মূল্যবান চামর হস্তে তার দু'পাশে এসে দাঁড়ালো, হাওয়া করতে লাগলো তারা বনহুরকে। একজন বনহুরের দক্ষিণহস্তখানা ধরে শয্যায় দিকে এগুলো। বনহুর যন্ত্রচালিতের মত এগুলো।

বনহুরকে যুবতীগণ বসালো শয্যার উপরে।

বনহুর বসলো। অবোধ শিশুর মতই যেন সে ওদের ইচ্ছামত সব করতে লাগলো।

এবার যুবতীগণের মধ্য হতে একজন বনহুরের মাথার পাগড়ীটা খুলে টেবিলে রাখলো।

অন্যজন পা থেকে জুতো জোড়া খুলে নিলো যত্নসহকারে।

বনহুর অর্ধশায়িত অবস্থায় শয্যায় ঠেশ দিয়ে শুয়ে পড়লো।

যুবতীগণ বনহুরকে ঘিরে বসলো চারপাশে—কেউ বা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, কেউ বা হাতে, কেউ বা পায়ে। একজন বনহুরের সম্মুখে, একটা বেহালার মত যন্ত্র নিয়ে বসে পড়লো। অদ্ভুত এক সুরের সৃষ্টি হলো কক্ষমধ্যে। অপূর্ব সে সুর। যুবতী তন্ময় হয়ে বাজিয়ে চললো বেহালাটা।

এবার একজন যুবতী নাচতে শুরু করলো। বিচিত্র ভঙ্গিমায় নাচতে লাগলো সে।

বনহুর নিজেও যেন ধীরে ধীরে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

শয্যার পাশেই ছিলো একটা গোল টেবিল। দুগ্ধধবল শ্বেত পাথরে তৈরি টেবিলটার উপরে স্তুপাকার নানা ফলমূল। একজন যুবতী টেবিল থেকে সুস্বাদু ফলগুলো তুলে দিতে লাগলো বনহুরের মুখে। সুমিষ্ট আংগুর ফল আর আনারস খেয়ে বনহুর অসীম তৃপ্তি বোধ করলো। বনহুরের কাছে ফল ছিলো অত্যন্ত প্রিয়। কাজেই ফল সে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে লাগলো।

বনহুর নাচ দেখছে—সত্যি এমন নাচ সে কোনোদিন দেখেনি। বৈচিত্রময় ভঙ্গিমায় নেচে চলেছে যুবতীটি। নাচের তালে তালে তার যৌবনভরা সুঠাম অঙ্গগুলো দুলে দুলে উঠছিলো। বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো—না না, এসব কি হচ্ছে। ঝাঁম শহরের নির্জন এক বাড়িতে তারই প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে মৃতপ্রায় কতগুলো নারীপুরুষ, ক্ষুধা-পিপাসায় যাদের দেহ হয়ে গেছে ক্ষীণ,

অস্থি-পাঁজর ছাড়া কিছুই যাদের নজরে পড়ে না, সে সব অসহায় ভাই-বোনদের রেখে সে সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে চলেছে! মনের আনন্দের জন্য দর্শন করে চলেছে বৈচিত্রময় মনমাতানো নাচ। এক মুহূর্ত তার বিলম্ব করা ঠিক নয় আর। বনহুরের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো, যুবতীগণকে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ইংগিত করলো সে।

যুবতীগণ অবাক হলো, এর পূর্বে কোনো অতিথিকে তো এমন দেখেনি। সব পুরুষই তাদের পেয়ে আনন্দে মেতে উঠেছে। নানা রকম আলাপ-আলোচনা আর হাসি-গান করেছে তাদের নিয়ে। কেউ তো তাদের এমনভাবে উপেক্ষা করেনি।

যুবতীগণ বনহুরের ইংগিত অনুসারে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

শুধুমাত্র একজন, যে বেহালা বাজাচ্ছিলো সে বসে রইলো—তার হাতে তখনও বেহালা। হরিণ-ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে আছে সে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর নিপুণ চোখে তাকিয়ে দেখলো—যুবতী ঝাঁমবাসিনী হলেও অপূর্ব তার চেহারা, কতকটা ইরাণী মেয়েদের মত। মাথায় ঝাকড়া চুল, কপালে চন্দনের টিপ, দেহের রং গোলাপী। ঠোঁট দু'খানা সরু রক্তজবার মত লাল টুকটুকে।

বনহুরের দিকে তাকিয়ে ঝাঁম ভাষায় বললো—তুমি কেমন লোক, এতোগুলো মেয়ের একটিকেও তোমার পছন্দ হলো না?

বনহুর সোজা হয়ে বসে হেসে বললো—তোমাদের সবাইকে আমার পছন্দ কিন্তু সবচেয়ে বেশি তোমাকে।

বনহুরের কথায় যুবতী খুশি হলো, বললো—আমার বোনদের চেয়ে আমি সুন্দর, একথা আরও অনেকের মুখে শুনেছি। এটা আমার পরম সৌভাগ্য---

যুবতী হাত বাড়ালো বনহুরের দিকে।

বনহুর যুবতীর কোমল হাতখানার উপর হাত রাখলো।

একি, যুবতী ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে, বনহুরের মুখের কাছে মুখ এগিয়ে আনলো।

বনহুর অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে রাখলো যুবতীর কাছ থেকে, কিন্তু যুবতীর উষ্ণ নিঃশ্বাস তার ধমনীতে আলোড়ন জাগালো। নিজের ঠোঁটখানা দাঁত দিয়ে দংশন করতে লাগলো সে। যুবতীর হাতের মুঠায় তার দক্ষিণ হাতখানা তখন চাপা রয়েছে।

বনহুর বললো—তোমার নাম কি সুন্দরী?

যুবতী জবাব দিলো—সাম্‌শী।

বনহুর অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করলো—সাম্‌শী।

যুবতী এতো ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে যে বনহুর একটু পিছিয়ে বসতে বাধ্য হলো, বললো —সামশী, আজ আমার বিশ্রাম করবার সময় নেই, উঠতে হবে এখন।

অবাক কণ্ঠে বললো সাম্‌শী—আজ থাকবে না এ বিশ্রামাগারে?

না। অনেক কাজ আছে।

কিন্তু রাজা তো কাউকে এভাবে যেতে দেয় না?

রাজা আমাকে যেতে না দিলেও যেতে হবে।

যুবতী করুণ চোখে তাকালো বনহুরের দিকে, বললো—আবার আসবে না?

আসবো।

তোমাকে আমারও খুব পছন্দ হয়েছে, বলো তোমার নাম কি?

আমার নাম মহাসিন্ধু।

মহাসিন্ধু।

হাঁ।

যুবতী নত হয়ে প্রণাম জানালো বনহুরকে।

বনহুর জানতো, তাদের সবচেয়ে বড় দেবতার নাম মহাসিন্ধু। কাজেই যুবতী তাকে স্পর্শ করবে না—এ লোকটা নিশ্চয়ই তাদের দেবতার সমতুল্য হবে। বনহুরের অনুমান মিথ্যা নয়, যুবতীটা বনহুরের নিকট হতে সরে দাঁড়ালো।

বনহুর বললো—যাও সাম্‌শী তোমার মুক্তি।

শাম্‌সী ধীরে ধীরে নত মস্তকে কক্ষ ত্যাগ করলো।

বনহুর এবার নিশ্চিন্ত মনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিলো, তারপর পুনরায় মহারাজের দরবারে হাজির হলো।

ঝাঁম রাজা বনহুরকে পাশে বসিয়ে নাচগানের নির্দেশ দিলো। শুরু হলো নাচ আর গান, দরবার-কক্ষ নানারকম বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজে মুখর হয়ে উঠলো।

বনহুরের কাছে এ উৎসব অসহ্য বোধ হচ্ছিলো, বিশ্রামাগারে নর্তকীদের কবল থেকে উদ্ধার পেলেও রাজার হাত থেকে মুক্তি পেলো না সে। সমস্ত রাত ধরে চললো নানারকম আনন্দ উৎসব।

শরাব পান করে ঢুলু ঢুলু হলো মহারাজের আঁখিদ্বয় রাজ পারিষদগণের অবস্থাও তাই। একসময় নাচগান বন্ধ হলো, বন্ধ হলো সমস্ত উৎসব। নিস্তব্ধ হলো দরবার কক্ষ।

কে কোথায় ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়লো তার ঠিক নেই। বনহুর ঘুমের ভাণ করে একটা আসনে বসে হেলান দিয়ে চুপ করে পড়ে রইলো।

রাত ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

রাজবাড়ির পাহারাদারগণও যে যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। বনহুর তখন আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, আলগোছে বেরিয়ে এলো বাইরে। কোষাধ্যক্ষের কক্ষে প্রবেশ করলো সে সন্তর্পণে। বিরাট বপুওয়ালা কোষাধ্যক্ষ মহাশয় ভুড়ি উচু করে নাক ডাকিয়ে ভোম্ হয়ে ঘুমাচ্ছিলো। বনহুরের জামার ভিতর পকেটে গুলী ভরা রিভলভার এখনও বিদ্যমান। বনহুর কোষাধ্যক্ষের শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালো, আজ তার খাওয়া বুঝি বেশি হয়েছিলো, তাই ঘুমটা বেশি জেকে গেছে।

বনহুর পকেট থেকে রিভলভার বের করে রিভলভারের ডগা দিয়ে কোষাধ্যক্ষের গা থেকে চাদরখানা সরিয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেংগে গেলো ঝাঁম কোষাধ্যক্ষের, ধড়ফড় করে উঠে বসে তাকালো, সম্মুখে তাদের নতুন অতিথিকে দণ্ডায়মান দেখে অবাক হলো কিন্তু তার হস্তস্থিত রিভলভারখানার উপরে নজর পড়তেই ফ্যাকাশে হলো তার মুখমণ্ডল। ঢোক গিলে বললো—আপনি এখানে?

বনহুর বললো—উঠে পড়ন দেখি।

রিভলভারের দিকে তাকিয়ে কোষাধ্যক্ষ মহাশয় কোনো কথা আর উচ্চারণ করতে পারলো না, ভয়কম্পিত দেহে শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো।

বনহুর কোষাধ্যক্ষসহ কোষাগারে প্রবেশ করে বললো—চাবি দ্বারা সিন্দুক খুলে ফেলুন।

বনহুর ইচ্ছামত অর্থ তুলে নিলো একটা থলেতে। তারপর একটা কাগজে খচ্ খচ্ করে লিখলো।

মহারাজ—
অপরাধ ক্ষমা করবেন; দুঃস্থ অনাথ
ভাই-বোনদের জন্য কিছু অর্থ অপ-
নার কোষাগার থেকে নিয়ে গেলাম
—দস্যু বনহুর

চিঠির অক্ষরগুলো বনহুর ঝাঁম ভাষায় লিখতে পারলো না, কারণ ঝাঁম ভাষা কিছুটা বলতে পারলেও লিখতে পারতো না। ইংরেজিতে লিখলো, বনহুর জানতো ইংরেজি কেউ না কেউ নিশ্চয়ই জানে। চিঠি খানা লিখে কোষাধ্যক্ষের হাতে গুঁজে দিলো—জাম, শো, মিংলো লাম্ সিয়াং। মানে, বন্ধু, এ চিঠিখানা তোমার প্রভুকে দিও।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কোষাধ্যক্ষ মহাশয়।

বনহুর টাকার থলেটা বাম হাতের মুঠায় চেপে ধরে ডান হাতে রিভলভার উদ্যত রেখে বেরিয়ে গেলো কোষাগার হতে।

❑

ঝাঁম জঙ্গল।

মঙ্গল ডাকুর আস্তানা আজ ধ্বংসলীলায় পরিণত। যে স্থানে শিবমন্দির ছিলো আর ছিলো আস্তানায় প্রবেশের সুড়ঙ্গমুখ, সব ধসে পড়েছে। শিবমন্দিরের কোনো চিহ্নটি পর্যন্ত নেই সেখানে।

ঝাঁম জঙ্গলের বিস্তৃত এলাকা নিয়ে গভীর খাদের সৃষ্টি হয়েছে। গাছপালা লতাগুল্ম সব বসে গেছে মাটির তলায়।

ঝাঁম জঙ্গলে মঙ্গল ডাকুর আস্তানা ধ্বংস হবার তিন দিন পর গভীর খাদের মধ্য হতে রক্ত মাখা বীভৎস দেহে কচ্ছপের মত উঠে এলো মঙ্গল ডাকু স্বয়ং। দক্ষিণ চোখটা তার সম্পূর্ণ গলে গেছে। চোয়ালের একটা হাড় ভেঙ্গে যাওয়ায় মুখটা বাঁকা হয়ে গেছে যেন একপাশে। বামহস্তটা উড়ে গেছে একেবারে। এক হস্ত এবং এক চক্ষুহীন মঙ্গল ডাকু তিন দিন তিন রাত্রি মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকার পর জ্ঞান লাভ করে। স্বজ্ঞানে ফিরে মঙ্গল ডাকু স্মরণ করে এখন সে কোথায়, তার এ অবস্থা কেন? ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে—মনে পড়ে দস্যু বনহুরের দলবলের আক্রমণের কথা। মনে পড়ে তার পরাজয়ের কথা। তার কদাকার মুখটা প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে উঠে। ভাগ্যিস মঙ্গল ডাকুর পা দু'খানা বিনষ্ট হয়নি তাই সে আবার পৃথিবীর আলো-বাতাস গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভে সক্ষম হলো।

মাটি ফুঁড়ে কচ্ছপের মত বেরিয়ে এলো মঙ্গল ডাকু। বন্য শুয়োরের মত ঘোৎ ঘোৎ করতে লাগলো রাগে। একটি অনুচরও তার আজ অবশিষ্ট নেই।

একদিন যে ডাকুর ভয়ঙ্কর হুঙ্কারে ঝাঁম জঙ্গলের মাটি প্রকম্পিত হতো, আজ সে ডাকু একটা পোড়ো হাতীর মত গড়াচ্ছে।

অজস্র টাকা-পয়সা আর ধন-রত্ন সব রয়ে গেলো মাটির তলায়। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত শুষে পাতালপুরী গহ্বরে যে সৌধ গড়ে তুলেছিলো সব তলিয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেছে, চাপা পড়ে গেছে মাটির নিচে।

মঙ্গল ডাকু আজ নিঃস্ব, শুধু নিঃস্বই নয়, ভয়ঙ্করভাবে আহত। টলতে টলতে এগুলো সে ঝাঁম শহরের দিকে।

এমন সময় একদল শিকারী ঝাঁম জঙ্গলে এসেছিলো, শিকারের আশায়, তাদের নজরে পড়ে যায় মঙ্গল ডাকু।

আহত মঙ্গল ডাকুকে দেখে তারা অবাক হয়, বলে—কে তুমি? এ জঙ্গলে কি করে এলে?

মঙ্গল ডাকু করুণ অসহায় কণ্ঠে বললো—আমি একজন শিকারী। এ জঙ্গলে শিকারের আশায় এসেছিলাম, হঠাৎ একটা বাঘ আমাকে তাড়া করে, আমি নিরুপায় হয়ে গাছে উঠি। কিন্তু গাছে উঠতে গিয়ে পড়ে যাই এবং এভাবে আহত হই। তোমরা দয়া কর, আমাকে শহরে নিয়ে চলো, আমাকে কেনো হসপিটালে ভর্তি করে দাও। আমি আর কিছুই চাই না তোমাদের কাছে।

শিকারিগণের মনে দয়ার সঞ্চার হলো, তাইতো লোকটা বড় অসহায়। ওকে ঘোড়ায় তুলে নিলো, নিজেদের সঙ্গে যে খাবার ছিলো তাই খেতে দিলো ওকে।

শিকারিগণ জানে না, কত বড় ভয়ঙ্কর জীবকে তারা জীবিত করতে যাচ্ছে। যেমন বিষধর সর্পকে দুধ খাইয়ে জিইয়ে তোলা, ঠিক সেরকম। সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে সাংঘাতিকভাবে।

মঙ্গল ডাকুকে নিয়ে শিকারিগণ চললো ঝাঁম শহরে এবং একটা ভাল হসপিটালে তাকে ভর্তি করে দিলো।

বনহুর এক গাদা জামা কাপড় আর খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ফিরে এলো তার ভাড়াটে বাড়িতে, যেখানে তার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে অগণিত অসহায় ভাই-বোন।

বনহুর প্রত্যেককে জামা এবং কাপড় দিয়ে বললো—তোমরা এসব পরে নাও। আর খাবার আছে, পেট পুরে খাও।

কায়েস, সোহরাব আর মাহমুদকে নির্দেশ দিলো—এদের সুখ-সুবিধার দিকে খেয়াল রাখো।

বনহুরের নির্দেশে কায়েস তাদের সুঃস্থ অসহায় অতিথিদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলো। মঙ্গল ডাকুর নির্মম অত্যাচারে নিষ্পেষিত বন্দী এবং বন্দিনীগণ এতো ক্ষীণ হয়ে পড়েছিলো যে তাদের কথা বলবার মত তেমন ক্ষমতাই ছিলো না। সেই শিকলের আঘাতে এক এক জনের হাত পায়ে এবং গলায় ঘা হয়ে গিয়েছিলো। বনহুর প্রত্যেকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলো।

ঝাঁম শহর থেকে ডাক্তার ডাকা হলো।

ডাক্তার নিয়মিতভাবে রোগী দেখতে লাগলেন।

এসব দুঃস্থ ভাই-বোনদের জন্য প্রতিদিন প্রচুর অর্থ ব্যয় হতে লাগলো। বনহুর রাজকোষ থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে এনেছিলো তাতেই প্রচুর খরচ চললো।

কয়েক দিনের মধ্যেই অপরিসীম প্রচেষ্টায় তার অসহায় অতিথিগণ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো। ক্ষীণ দেহগুলোতে শক্তির সঞ্চার হলো, সবল হয়ে উঠতে লাগলো তারা। লৌহশিকলের চাপে তাদের দেহে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিলো দিন দিন তা শুকিয়ে এলো।

বনহুর নিজে পাশে বসে ওদের দেখাশোনা করতো, কার কখন কি প্রয়োজন নিজে জেনে নিয়ে সেভাবে ব্যবস্থা নিতো। সবাইকে সস্নেহে সান্ত্বনা দিতো, কখনও বা নিজ হস্তে ঔষধ লাগিয়ে দিতো তাদের ক্ষতে।

ক্রমান্বয়ে সবাই সুস্থ সবল হয়ে উঠলো। বনহুর এবার আদেশ দিলো কায়েস, সোহরাব আর মাহমুদকে, তোমরা এদের নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো।

বনহুর নিজেও এ কাজে মনোযোগ দিলো। অসহায় দুঃস্থ ব্যক্তিদের পৌঁছে দিতে লাগলো সে নিজে তাদের বাড়ি গিয়ে। বনহুর রাজ কোষাগার হতে অর্থ নিয়ে আসার পর হতে সে আত্মগোপন করেছিলো। অবশ্য সে ছদ্মবেশে শহরে বিচরণ করে ফিরতো, কেউ যাতে তাকে চিনতে না পারে।

বনহুর একটা এক্কা ঘোড়ার গাড়ি কিনে নিয়েছিলো, সেই ঘোড়ার গাড়ি করেই সে এই সর্বহারা মুক্ত বন্দীদের তাদের নিজ নিজ আবাসে পৌঁছে দিচ্ছিলো।

কেউ তাকে দেখলে সহসা চিনতে পারবে না—সম্পূর্ন কোচওয়ানের ড্রেস তার দেহে।

❑

বনহুর অবসর সময়েও খালি গাড়ি নিয়ে শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতো, কোচওয়ানের বেশে কোচবাক্সে বসে ঘুরে দেখতো ঝাঁম শহরটি।

রাজা তো সেদিনের ঐ ঘটনার পর রাজ্যময় ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি কালো পোশাক পরা অতিথিকে ধরে দিতে পারবে, তাকে দশ হাজার টাকা এবং একটা ভাল চাকুরী দেওয়া হবে।

সেই ঘোষণার পর হতে রাজ্যের লোকজন সবাই উন্মুখ হয়ে উঠেছে, সকলেরই ইচ্ছা এই দশ হাজার টাকা লাভ করে এবং একটা ভাল চাকুরী পায়। কালো পোশাক পরা লোক দেখলেই ঝাঁমবাসিগণ তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাজদরবারে হাজির করে।

রাজা স্বয়ং পরীক্ষা করে দেখে ছেড়ে দেন, কিংবা বন্দী করে রাখেন। রাজ-কারাগার কালো পোশাক পরা ঝাঁমবাসী দ্বারা পূর্ণ হয়ে উঠলো। ভয়ে আর কেউ এ শহরে-কালো পোশাক পরতে চায় না। এমন কি সম্মানিত

ব্যক্তিগণও নয়। কচিৎ কোনো কারণে কালো পোশাক পরে শহরে বের হলেই তার মুক্তি নেই, ধরা পড়ে যেতে হবে রাজদরবারে।

বনহুর শহরে ঘুরে বেড়ানোকালে পাহারাদারগণ তার গাড়ি পরীক্ষা করে দেখতে কসুর করে না, গাড়ি রুখে তারা গাড়ির ভিতরে ভালভাবে দেখে নেয়—এ গাড়িতে সেই কালো পোশাক পরা অতিথি আছে কি না।

বনহুর সেই অংগুরীটা খুলে রেখেছে, হঠাৎ যদি কারো দৃষ্টিপথে পড়ে যায় তাহলে আর রক্ষা থাকবে না, ধরে নিয়ে যাবে ঝাঁম রাজার কাছে। কাজ কি অহেতুক সময় নষ্ট করে।

সেদিন বনহুর যখন বিশ্রাম করছিলো তখন কায়েস এসে বললো—সর্দার, আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। ঝাঁম শহরে যাদের বাড়ি তাদের সবাইকে পৌঁছে দেওয়া হয়ে গেছে। আর ঝাঁম শহরের বাইরে যাদের বাড়ি তাদের সোহরাব আর মাহমুদ নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

বনহুর বললো—যাক্ এবার তাহলে আমি নিশ্চিন্ত।

সর্দার, একটি যুবতী এখনও রয়ে গেছে।

অবাক কণ্ঠে বনহুর বলে —কেন?

এ পৃথিবীতে তার কেউ নেই।

তার মানে?

সর্দার, সে কোথায যাবে এমন আশ্রয় তার নেই।

হুঁ, কিন্তু এখানেই বা তার আশ্রয় কি করে সম্ভব কায়েস?

সর্দার, আমরা অনেক করে বললাম কিন্তু সে কেঁদে-কেটে আকুল হলো, কোথায় যাবে ভেবে পাচ্ছে না।

নতুন এক দুশ্চিন্তায় ফেললে কায়েস।

তাছাড়া মেয়েটি ঝাঁম অধিবাসীও নয়।

কোথায় থাকতো সে?

সে বললো তার বাড়ি নাকি বাংলাদেশে।

বাংলাদেশে?

হাঁ সর্দার।

কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করলো বনহুর—তার চোখের সামনে বাংলাদেশে প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠতে লাগলো। বাংলাদেশে সে গিয়েছিলো, বাংলার মাটির আস্বাদও সে গ্রহণ করেছে। বললো বনহুর—চলো কায়েস, দেখি কে সে মেয়ে যার দেশ বাংলায়।

কায়েসসহ বনহুর ভিতরে গেলো। যে কক্ষে সেই তরুণী ছিলো ঐ কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর আর কায়েস।

বনহুর নারীদের মুক্ত করে আনলেও প্রত্যেককে ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখার মত তার সময় ছিলো না, এ মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে তাকালো তরুণীর দিকে। তরুণীর মুখে নজর পড়তেই চমকে উঠলো বনহুর— কোথায় যেন ওকে দেখেছে, অতি পরিচিত মুখ বলে মনে হলো। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুর তরুণীর দিকে।

তরুণীর মুখোভাব স্বাভাবিক, বনহুরকে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে দৃষ্টি নত করে নিলো সে।

বনহুর বললো—তোমাকে আমি পূর্বে কোথাও দেখেছিলাম?

তরুণী মাথা তুললো, কিছুদিন পূর্বের সেই জীর্ণ-শীর্ণ দেহখানা এখন যৌবন ঢলঢল হয়ে উঠেছে। ছিন্ন-ভিন্ন পোশাক পরিচ্ছদ আর নেই, এখন ভাল শাড়ী অঙ্গে শোভা পাচ্ছে। তরুণী স্থির নয়নে তাকিয়ে বললো—আমি সুভাষিণী।

বনহুরের ভ্রুকুঞ্চিত হলো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো—তুমি সুভাষিণী।

হাঁ, আমাকে চিনতে পারোনি এতোদিন?

বনহুর কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে পড়লো সুভাষিণীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা। ---ডাকাতের কবল থেকে সুভাষিণীকে বনহুর উদ্ধার করেছিলো এবং নিজের ঘোড়ায় তাকে পৌঁছে দিয়েছিলো তার পিতামাতার নিকটে। সে আজ অনেকদিন আগের কথা, বনহুরের মন থেকে কবে মিশে গেছে সে সব স্মৃতিগুলো। আজ নতুন করে মনে উদয় হয় আবার সেই তলিয়ে যাওয়া স্মৃতির প্রতিচ্ছবি।

সুভাষিণী ভালবেসে ফেলেছিলো বনহুরকে, বনহুরের অপরূপ সৌন্দর্য তাকে পাগল করে তুলেছিলো কিন্তু বনহুরের মনকে আকৃষ্ট করতে পারেনি সুভাষিণী। সেই সুভাষিণী আজ আবার তার সম্মুখে। বনহুর বললো—চিনতে পেরেছি তোমাকে।

আজ চিনলে তুমি? কিন্তু আমি তোমাকে সেদিনই চিনেছিলাম যেদিন তুমি ঝাঁম জঙ্গলে মঙ্গল ডাকুর ভূগর্ভস্থ আস্তানার বন্দীশালায় প্রথম প্রবেশ করেছিলে।

বনহুর নিস্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকে সুভাষিণীর কথাগুলো। বলে চলে সুভাষিণী—তোমাকে দেখেই আমি চিনতে পারলেও আমি কোনোরকম উক্তি উচ্চারণ করিনি বরং নিজেকে গোপন রাখার চেষ্টা করেছি। কারণ আমার অবস্থা তখন বর্ণনাতীত ছিলো।

বনহুর বললো—তোমার পিতামাতা এবং স্বামী—এরা কোথায়?

সবাইকে ঐ নরাধম শয়তান মঙ্গল ডাকু হত্যা করেছে।

বলো কি? অস্ফুট ধ্বনি করে বনহুর।

সুভাষিণীর গণ্ড বেয়ে পড়ে তপ্ত অশ্রুধারা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সে, কান্না থামিয়ে বলে—মঙ্গল ডাকু বন্ধু সেজে প্রথমে বাবাকে হত্যা করে তারপর মাকে। বাবা-মাকে হত্যা করে তাদের যথাসর্বস্ব লুটে নিয়ে একদিন গভীর রাতে হানা দেয় আমার শ্বশুর বাড়িতে। শ্বশুরকেও হত্যা করে নির্মম পাষণ্ড---

ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠে বনহুর—তোমার স্বামী?

আমার স্বামীকেও সে আমার সঙ্গে বন্দী করে নিয়ে এসেছিলো কিন্তু ওর আস্তানায় আসার পর তাকে আর কোনোদিন দেখিনি।

বলো কি সুভাষিণী?

হাঁ, তাকে ওরা হত্যা করেছে না জীবিত রেখেছে তাও জানি না।

বনহুর বললো এবার—বন্দীদের মধ্যে খুঁজে দেখেছিলে তুমি?

অনেক খুঁজেছি, বন্দীদের মধ্যে আমার স্বামীকে পাইনি।

চিন্তিত কণ্ঠে বললো বনহুর—তাহলে সে গেলো কোথায়? শয়তান মঙ্গল ডাকু তাকে কোথায় সরিয়েছিলো?

সুভাষিণী আঁচলে চোখের জল মুছে বলে—ভগবান জানেন।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলে বনহুর—এখন তুমি কি করতে চাও?

নত মস্তকে বসেছিলো সুভাষিণী, মাথা তুলে একবার তাকালো বনহুরের দিকে, তারপর দৃষ্টি নত করে নিয়ে বললো—এখন মৃত্যু ছাড়া কোনো পথ নেই আমার।

বনহুর কোনো কথা বলতে পারলো না, সে মন্থর গতিতে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

কায়েসও ছিলো তার পাশে, সে বনহুরকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এলো।

নিজের কক্ষে এসে বসলো বনহুর।

কায়েস দাঁড়িয়ে রইলো তার পাশে।

বনহুর বললো—কায়েস, সুভাষিণীর কথা শুনেছো?

হাঁ সর্দার।

এখন কি করা যায়?

সর্দার, মেয়েটি বড় অসহায়—তার বাবা-মা কেউ নেই। স্বামীর সন্ধানও সে জানে না, এমন অবস্থায় তাকে কোথাও তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু এখানে রাখাও সম্ভব নয় জানো?

জানি সর্দার।

কারণ ঝাঁমের কাজ আমার শেষ হয়েছে। এবার আমি আস্তানায় ফিরে যাবো।

সর্দার।
বলো?
মেয়েটিকে আমাদের সঙ্গে নিলে হয় না?
আমার আস্তানায় বাইরের নারী—অসম্ভব কায়েস।
কি করবেন তাহলে?
বনহুর পায়চারি শুরু করলো, কোনো কথা বললো না বা বলতে পারলো না।
কায়েস ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

❑
কারাগারে বন্দিনী নূরী।
নরহত্যার দায়ে তাকে আটক করা হয়েছে।
বিচার শেষে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।
নূরী চিন্তায় মগ্ন। নিজের জন্য সে চিন্তিত নয়—যত ভাবনা তার বনহুরের জন্য আর চিন্তা নূরের জন্য। এতদিনে নূর তাকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলো। এক মুহূর্ত নূর তাকে ছাড়া থাকতো না। কোনোরকমে স্কুলের সময়টা সে স্কুলে যেতো তারপর সর্বক্ষণ নূরীর পাশে পাশে থাকতো। প্রথম প্রথম কিন্তু নূর কিছুতেই ফুলের কাছে আসতে চাইতো না, ফুল ওকে কোলে করতে গেলে ছুটে পালিয়ে যেতো। ঘুমের সময় ফুল ওকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করতো, চুমু দিতো নরম ছোট গাল দু'টিতে।
কতদিন নূরকে এভাবে আদর করতে দেখে মনিরা অবাক হয়ে গেছে। প্রথম দিকে সন্দেহ জেগেছিলো মনে, ফুল এভাবে তার সন্তানকে আদর করে কেন? কতদিন দেখেছে—নূর যখন ঘুমাচ্ছে ফুল তখন শিয়রে বসে নীরবে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। কখনো বা ওর ছোট্ট ললাটে হাত ঝুলিয়ে দিচ্ছে, কখনো বা পাকা দিয়ে বাতাস করছে ধীরে ধীরে।
মনিরা অনেকদিন ক্রুদ্ধ হয়েছে এ ব্যাপারে, সন্দেহের ছোয়া লেগেছে তার মনে কিন্তু কিছুদিন পর সে ভুল ভেঙ্গে গিয়েছিলো, মনিরা চুপি চুপি লক্ষ্য করেছে—তার সন্তানের কোনো অমঙ্গল ফুল করে কি না। কিন্তু ফুলের মধ্যে সে কোনোরকম সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করেনি বা করতে পারেনি।
মনিরা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেছিলো ফুলকে, তাই সে ভালও বেসেছিলো ওকে গভীরভাবে কিন্তু একদিনের ঐ ঘটনার পর সব বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো মুহূর্তে। এমন মেয়ের মধ্যেও এতেবড় দোষ আছে! তার স্বামীর চরিত্রকে ফুল কলুষিত করেছে— না না, তাকে সে ক্ষমা করতে পারে না। কিছুতেই মনিরা সহ্য করতে পারেনি সেদিন ফুলকে। বাড়ি থেকে

তাড়িয়ে দিয়েও শান্তি পাচ্ছিলো না, অহরহ তুষের আগুনের মত দাহ হচ্ছিলো তার মন। বিশেষ করে সে ভাবতেও পারছে না তার স্বামী চরিত্রহীন।

ফুলকে বাড়ি থেকে বের করে দেবার পর মনিরা অসহনীয় মনোকষ্ট বোধ করছিলো। না জানি মেয়েটি গেলো কোথায়, বিদেশ বিভূঁই জায়গা—কেই বা ওকে খেতে দেবে, কেই বা দেবে আশ্রয়; পথে পথে ধুকে মরবে। পরক্ষণেই মনের মধ্যে একটা দুর্দমনীয় ক্রুদ্ধভাব জেগে উঠেছে—ওকে বাড়ি থেকে বিতারিত করে ভালই করেছে সে। যে মেয়ে অপর একটি পুরুষের সঙ্গে মিশতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না তাকে এভাবেই শাস্তি দেওয়া উচিত। ওর মুখ না দেখাই ভাল।

নূরী চলে যাবার পর মনিরা অন্তরে অন্তরে দাহ হচ্ছিলো বটে কিন্তু মুখে সে স্বাভাবিক ছিলো। মরিয়ম বেগম পরদিন মনিরাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মনিরা, ওকে এভাবে তাড়িয়ে দেওয়া কি ঠিক হয়েছে?

মনিরা মামীমা'র কথায় বুঝতে পারলো, আলীর মা তাঁকে সব বলে দিয়েছে। মনিরা গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলো—ব্যাভিচারিণী মেয়েকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ভালই করেছি। তাছাড়া কোনো উপায় ছিলো না।

কিন্তু নূরকে যে রাখাই যাচ্ছে না, সব সময় ফুল ফুল করে কাঁদছে। সারাটা দিন গেলো নূর মুখে কিছু দেয়নি।

মনিরা রাগতভাবে বললো—আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম মেয়েটি যাদু জানে।

অবাক হয়ে বলেছিলেন মরিয়ম বেগম—মেয়েটি যাদু জানতো?

হাঁ, না হলে সে আমার নূরের মত ছেলেকে এমনভাবে আপন করে নেয়। শুধু তাই নয় মামীমা, ফুল আমার সর্বনাশ করেছে।

বিস্ময়ে দু'চোখ কপালে উঠে মরিয়ম বেগমের, মনিরা বলে কি?

মনিরা তেমন কঠিন কণ্ঠেই বলেছিলো আবার —জীবন থাকতে আমি ফুলকে ক্ষমা করবো না।

কিন্তু নূর---

মরিয়ম বেগমকে কথা শেষ করতে দেয়নি মনিরা, বলেছিলো —নূরের জন্য তুমি কিছু ভেবো না, আমি ওকে শুধরে নেবো।

তারপর মরিয়ম বেগম কোনো কথা বলতে পারেননি। চলে গিয়েছিলেন মন্থর গতিতে।

নূর কিন্তু রেহাই দেয়নি মাকে, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছিলো মনিরাকে—মাম্মি, ফুল কই? ফুলকে দেখছি না কেন?

মনির ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সন্তানকে তিরস্কার করে বলেছিলো—আমি জানিনা।

মায়ের রাগতভাব লক্ষ্য করে আর দ্বিতীয়বার কিছু বলতে সাহস পায়নি নূর, বেরিয়ে গিয়েছিলো দাদীমার কক্ষে। দাদীমাকে ধরে বলেছিলো—দাদু, ফুল কোথায় গেছে বলো না? দাদু, ফুল কোথায় গেছে বলো?

মরিয়ম বেগম বলেছিলেন—চলে গেছে দাদু।

কোথায় গেছে? কখন আসবে বলো না দাদু?

নূর মাঝে মাঝে দাদীমাকে দাদু বলে ডাকতো। আজও সে ফুলের জন্য ব্যতিব্যস্ত করে তুললো।

অনেক করেও নূরকে প্রকৃতিস্থ করা সম্ভব হচ্ছিলো না। নূর ফুলকে অত্যন্ত ভালবেসে ফেলেছিলো।

চৌধুরী বাড়ির অনেকেই ফুলের জন্য অন্তরালে অশ্রু ফেলেছিলো সেদিন। মরিয়ম বেগম নিজেও বিশেষভাবে ব্যথিত-মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন ফুলের জন্য, কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি কিছু বলতে পারেননি যেহেতু মনিরা ফুলের নাম পর্যন্ত শুনতে চায় না আর।

চৌধুরী বাড়িতে ফুলের জন্য নূর যেমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো তেমনি, কান্দাই হাজতে বসে নূরের জন্য নীরবে রোদন করছিলো নূরী। নূরকে সে শুধু ভালই বাসতো না নিজ সন্তানের চেয়ে অধিক স্নেহ করতো। শুধু নূরকে পাশে পাবে বলেই নূরী তার হুরের কাছে কথা দিয়েছিলো, শহরে চৌধুরী বাড়িতে সে থাকবে। নূরকে পাওয়া তার যে চরম সান্ত্বনা ছিলো—কিন্তু সব অদৃষ্ট, তাই তাকে পথ বেরিয়ে পড়তে হয়েছিলো। হায়, সে কি ভাবতে পেরেছিলো নিয়তি তাকে এভাবে পরিহাস করবে।

চৌধুরী বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার পর সে অসহায়ার মত পথে পথে ঘুরেছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কণ্ঠ তার শুকিয়ে কাঠ হয়েছে, তবু এতোটুকু সহানুভূতি পায়নি সে কারো কাছে। কি অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় সে প্রবেশ করেছিলো হোটেলে যার পরিণাম তাকে টেনে এনেছে এতোদূর।

মেঝেতে বসে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিলো নূরী। শেষ পর্যন্ত তার ললাটে নরহত্যার দায়ে মৃত্যুই ছিলো প্রাপ্য।

কান্দাই পুলিশ ইন্সপেক্টর রওশান রিজভী নূরীর কেস সম্বন্ধে তদারক করছিলেন। নূরীকে যেদিন মিঃ রিজভী প্রথম দেখলেন সেদিন ওর প্রতি একটা অনুরাগ এসে গিয়েছিলো তার মধ্যে। নূরীর চেহারা এবং চাল-চলনে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি।

রওশান রিজভী স্বয়ং নূরীর জবানবন্দী গ্রহণ করার সময় জানতে পেরেছিলেন নূরী নিজেকে রক্ষা করার জন্যই নরহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলো।

রওশান রিজভী তাই কেসটা যাতে হাল্কা হয়ে আসে এবং তরুণীটা মুক্তি লাভ করে, এ নিয়ে চেষ্টা করছিলেন।

তরুণ অফিসার রিজভী যেমন ভদ্র তেমনি ছিলেন অমায়িক। তার সদাশয় ব্যবহারে প্রত্যেকে সন্তুষ্ট ছিলো। নূরীর কেসের ব্যাপারে তিনি বুদ্ধিমানের ন্যায় কাজ করতে লাগলেন। অসহায়া অনাথা মেয়েটি বিনা অপরাধে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করবে—এ কখনও হতে পারে না।

কেস চলতে লাগলো।

রওশান রিজভী নূরীর পক্ষ অবলম্বন করে উকিল দিলেন এবং টাকা-পয়সা খরচ করতে লাগলেন।

নূরী যখন জেলে বন্দিনী তখন বনহুর ঝাঁম শহরে কোথায় কোন্ অসহায় পথে পথে ধুকে ধুকে মরছে—তারই অন্বেষণ করে ফিরছে। যার কেউ নেই তাকে পথ থেকে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে অতিথিশালায়। যে অসুস্থ তাকে নিজের গাড়িতে উঠিয়ে ভর্তি করে দিচ্ছে সে হস্পিটালে।

একদিন বনহুর কোচওয়ানের বেশে একটি রোগীকে হসপিটালে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছিলো সে মুহূর্তে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে—এই কোচওয়ান, শোনো।

কোচবাক্সে বসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো বনহুর, গাড়ি থেমে পড়লো। দেখতে পেলো একটা বিকৃত আকার লোক এগিয়ে আসছে, তার এক চোখ অন্ধ এবং এক হস্তবিহীন। কিছুটা নিকটবর্তী হতেই চমকে উঠলো বনহুর—এযে সেই দুর্ধর্ষ শয়তান মঙ্গল ডাকু! তবে কি সে বোমা বিস্ফোরণেও নিহত হয়নি।

বনহুর গাড়ি রাখলো, মাথার পাগড়ীর আঁচলখানা দিয়ে মুখের খানিকটা ঢেকে ফেললো ভাল করে, যাতে চিনতে না পারে মঙ্গল ডাকু।

ঘোড়াগাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়ালো মঙ্গল ডাকু, আজই সে হসপিটাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। বনহুর অবাক হয়ে দেখলো মঙ্গল ডাকুর নির্মম পরিণতি। শয়তানের উপযুক্ত সাজা হয়েছে। বোমের আঘাতে তার একটি হাত এবং একটি চোখ সম্পূর্ণ উড়ে গেছে। মুখের নিচের কিছুটা অংশও খসে গেছে। মুখটা কেমন বাঁকা আর বিকৃত হয়ে উঠেছে সহসা কেউ তাকে দেখলে ভূত বলে ধারণা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মঙ্গল ডাকু এক লাফ দিয়ে ঘোড়াগাড়িতে উঠে বসলো। তারপর বললো—চলো।

বনহুর বললো কোচবাক্স থেকে—স্যার কোথায় যাবেন?

চলো, পরে বলবো—গাড়ির মধ্য থেকে বললো মঙ্গল ডাকু।

বনহুর হাসলো, লোকটার কি বোমার আঘাত খেয়ে মাথাও বিগড়ে গেছে। ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলো বনহুর। ঘোড়া ছুটতে শুরু করলো।

গাড়ি চলছে।

ঝাঁম শহরের রাজপথ বেয়ে গাড়ি ছুটছে, কোথায় যাচ্ছে কোনো ঠিক নেই। বেশ কিছুক্ষণ এ-পথ সে-পথ গাড়ি ছুটার পর বনহুর উচ্চকণ্ঠে বললো—কোথায় যাবেন স্যার বললেন না? আমি কোথায় নিয়ে যাবো?

গাড়ির ভিতর থেকে উত্তর এলো—এখন কোন্ রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছো?

কোচবাক্স থেকে জবাব দিলো বনহুর—ঝাঁম পুলিশ অফিসের রাস্তা।

গাড়ির মধ্য হতে এবার ভেসে এলো চাপা কণ্ঠস্বর—এ পথে এনেছো কেন?

তবে কোথায় যাবেন স্যার, বলুন?

আপাতত তোমার বাড়িতে চলো।

চমকে উঠলো বনহুর কোচবাক্সে বসে, বললো—স্যার, আমি গরীব মানুষ—আমার আবার বাড়ি, সে তো কুড়েঘর।

সেখানেই নিয়ে চলো।

অবাক হয়েছে বনহুর—বলে কি মঙ্গল ডাকু। এখন কোথায় নিয়ে যাওয়া যায় ওকে? বনহুর বুঝতে পেরেছে, মঙ্গল ডাকু এখন গৃহহারা, আস্তানাহারা, অনুচরহারা, সর্বস্বহারা—এমন কি হস্তহারা চক্ষুহারা সে। চালাক মঙ্গল ডাকু তাই কোচওয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নিতে চায়---

কোচওয়ানকে নীরব দেখে গাড়ির ভিতর থেকে বললো মঙ্গল ডাকু—কি হে, কিছু বলছো না যে?

বনহুর বললো—স্যার, আমার নিজের কোনো বাড়ি নেই।

তবে থাকিস কোথায় বেটা?

স্যার, পরের বাড়িতে থাকি।

শোন্ তবে।

বলুন স্যার?

আমাকে তোর কুটুম্ব বলে পরিচয় দিবি, নিয়ে চল।

কুটুম্ব।

হাঁ।

স্যার---

কোনো আপত্তি করবি না বলে দিলাম। কথাগুলো যেন ক্রীতদাসের প্রতি প্রভুর আদেশের মত কঠিন শোনালো।

বনহুর যেন বিপদে পড়লো, কি করা যায় ভাবতে লাগলো সে। সহজে ওকে এড়ানো সম্ভব হবে না, গাড়িতে যখন চেপে বসেছে তখন শেষ অবধি

গাড়িতেই আস্তানা গাড়বে। বনহুর ওকে সহজে ছাড়বার বান্দাও নয়, দেখা যখন ঘটেছে তখন সুভাষিণীর স্বামীর সন্ধান না নিয়ে রেহাই দিচ্ছে না মঙ্গল ডাকুকে। বাছাধন একেবারে এসে পা দিয়েছে সিংহের গহ্বরে।

হুঙ্কার শোনা গেলো ভিতর থেকে—কিরে ব্যাটা, কোনো কু'মতলব আটছিস নাকি?

ছিঃ ছিঃ এই যে নাকে-কানে খৎ দিচ্ছি, আমরা গরীব বেচারী, দুটো পয়সার জন্য খেটে মরছি রাতদিন। কু'মতলব আটবো কোন্ দুঃখে।

তবে নিয়ে চল্ যেখানে থাকিস্ তুই।

তাই চলুন স্যার।

বনহুর মঙ্গল ডাকুকে নিয়ে চললো বাসা অভিমুখে। এ—পথ সে পথ ঘুরে গাড়িখানা ছুটে চলেছে, কোচবাক্সে বসে দস্যু বনহুর আর গাড়ির মধ্যে বসে মঙ্গল ডাকু।

গাড়ি বাসায় এসে পৌঁছলো।

কোচবাক্সের উপর থেকে বনহুর নেমে পড়লো—স্যার, এ বাড়িতে আমি থাকি।

ততক্ষণে মঙ্গল ডাকু একলাফে গাড়ির ভিতর থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। বাড়িখানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখছে সে। বাড়ি দেখে অবাক হয়েছে মঙ্গল ডাকু, ভাবছে একটা কোচওয়ানের বাড়ি এমন হতে পারে।

বনহুর বুঝতে পারলো, মঙ্গল ডাকুর মনে বাড়িটা সন্দেহ জাগিয়েছে, তাই সে বললো—স্যার, এ বাড়ির মালিক আমার প্রভু হয়।

প্রভু!

হাঁ স্যার, প্রভু—মানে আমি তার মাইনে করা গোলাম।

ওঃ বুঝেছি, এ বাড়ির মালিকের কাছে চাকুরী করো?

হাঁ।

দেখো, তোমার মালিককে বলবে আমি তোমার আত্মীয়।

ঠিক্ তাই বলবো। আসুন স্যার আমার সঙ্গে।

বনহুর অগ্রসর হলো।

গেটের ভিতরে প্রবেশ করতেই সোহরাব আর মাহমুদ শসব্যস্তে এগিয়ে এলো, বনহুরকে লক্ষ্য করে মাহমুদ কিছু বলতে গেলো—সর্দার--

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর চোখের ইঙ্গিতে তাদের ক্ষান্ত হবার জন্য নির্দেশ দিয়ে বললো—সর্দার আমাকে খুঁজছিলো বুঝি?

মাহমুদ আর সোহরাব হঠাৎ কিছু বুঝতে না পেরে উভয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো। বনহুর পুনরায় বললো—কানে কম শুনছো নাকি?

এবার সোহরাব বলে উঠে—সর্দার এতোক্ষণ--

আরে বলছিতো এক্ষুণি আমি সর্দারের সঙ্গে দেখা করে সব বলবো, তারপর মঙ্গল ডাকুর দিকে তাকিয়ে হাতের মধ্যে হাত রগড়ে বললো—স্যার, আপনি সামনের ঘরে গিয়ে বসুন, আমার ফিরতে বিলম্ব হয়েছে বলে সর্দার রাগ করছেন, যাই তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলিগে।

মঙ্গল ডাকু মাথা দুলিয়ে বলে—আচ্ছা বসছি, কিন্তু ফিরতে দেরী করো না, আমি ভয়ানক ক্ষুর্ধাত।

বনহুর সোহরাব আর মাহমুদসহ অন্দর বাড়িতে প্রবেশ করলো। সোহরাব বললো—সর্দার, কিছু বুঝতে পারছি না?

তা পারবে কেন। জানো আমার সঙ্গী কে? তোমরা চিনতেও পারোনি?

না সর্দার।

মঙ্গল ডাকু।

সর্দার? আপনি বলেছিলেন সে নাকি বোমার আঘাতে পাতালপুরী আস্তানায় মারা পড়েছে।

আমার ধারণা ছিলো সে আর জীবিত নেই, কিন্তু তাকে আজ পথে দেখে গাড়িতে তুলে নিলাম।

সর্দার।

হাঁ, কারণ তাকে আমার প্রয়োজন। এসো তোমরা, কথা আছে তোমাদের সঙ্গে।

বনহুর সোহরাব ও মাহমুদকে সঙ্গে করে এগুচ্ছিলো, কায়েস ব্যস্তভাবে এসে পড়লো তাদের পার্শ্বে—সর্দার।

বনহুর কায়েস এবং তাদের তিনজনকে সঙ্গে করে এগুলো সুভাষিণীর কক্ষের দিকে, বললো—তোমার এসো।

সুভাষিণী বনহুর এবং তার অনুচর তিন জনকে তার কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে একটু অবাক হলো, নিশ্চয়ই কোনো কারণ ঘটেছে।

বনহুর একটা আসনে বসে পড়ে বললো—সুভাষিণী এসো, মন দিয়ে শোনো আমার কথাগুলো।

সুভাষিণী সরে এলো বনহুরের পাশে।

কায়েস, সোহরাব আর মাহমুদও বনহুরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, বনহুর বললো—মঙ্গল ডাকুর মৃত্যু হয়নি, সে জীবিত---

অস্ফুট কণ্ঠে বললো কায়েস—মঙ্গল ডাকু এখনও জীবিত।

শুধু জীবিতই নয়, সে এখন আমার বাড়িতে অতিথি।

শোনো তোমরা---বনহুর সংক্ষেপে সব কথা বললো, আরও বললো—কায়েস তোমাকে এ বাড়ির মালিক সাজতে হবে এবং সোহরাব ও মাহমুদ হবে তোমার চাকর, আমিও---

সর্দার---কিছু বলতে চেষ্টা করলো কায়েস।

বনহুর তাকে ক্ষান্ত হবার জন্য আদেশ করলো এবং বললো—তোমরা আমার কথা অনুযায়ী কাজ করবে। মঙ্গল ডাকুর নিকটে আমি জেনে নিতে চাই সুভাষিণীর স্বামীর সন্ধান। কিন্তু সহসা তার নিকট হতে একথা জানা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের ধৈর্যের প্রয়োজন। কৌশলে একথা জানতে হবে। কায়েস, তুমি শীঘ্র ঝাঁম সর্দারের ড্রেস পরে নাও। সোহরাব তুমি আর মাহমুদ মঙ্গল ডাকুর খাবারের আয়োজন করো। যাও কায়েস---

কায়েস পাশের কক্ষে চলে গেলো এবং অল্প সময়ে ঝাঁম সর্দারের বেশে বেরিয়ে এলো বাইরে।

বনহুরের বাড়িতে ছদ্মবেশ ধারণের প্রতিটি জিনিস বিদ্যামান ছিলো। কোনো অসুবিধা ছিলো না এসব আয়োজনের।

কায়েস ঝাঁম সর্দারেরবেশে বেরিয়ে এলো, বনহুর তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে দেখলো। মাথায় রঙীন পাগড়ী, ললাটে চন্দনের আলপনা, গলায় মতির মালা, হাতে মোটা বালা, কাপড়টা মাড়োয়ারীদের মত কুচি দিয়ে পরা। কানে দুটো মূল্যবান রুবী। রুবী দুটো দিয়ে উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা ঠিকরে বের হচ্ছে যেন।

বনহুর স্বয়ং মাথার পাগড়ীটা ভালভাবে ঠিক করে দিলো তারপর বললো—এখন তুমি আমার মালিক আর আমি হলাম তোমার চাকর, বুঝলে?

বুঝেছি সর্দার।

খবরদার, সর্দার বলে আমাকে ডাকতে যেও না যেন। মঙ্গল ডাকু কিছুতেই যেন টের না পায় আমি দস্যু বনহুর আর তোমরা আমার লোক।

ঠিক্ মনে থাকবে।

বেশ চলো। বনহুর অগ্রসর হলো।

মঙ্গল ডাকুর কক্ষের দরজায় এসে নত মস্তকে বললো বনহুর—স্যার, আমাদের সর্দার আসছেন।

মঙ্গল ডাকু একটু নড়ে বসলো, কিন্তু তার চোখটা চক্ চক্ করে উঠলো, বললো—বেটা এত দেরী হলো কেন?

সর্দার ব্যস্ত ছিলেন তাই একটু দেরী হয়ে গেলো স্যার।

ততক্ষণে ঝাঁম সর্দারের বেশে কায়েস প্রবেশ করলো কক্ষমধ্যে।

বনহুর নত মস্তকে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

মঙ্গল ডাকু উঠে করমর্দন করলো ঝাঁম সর্দারের।

ঝাঁম সর্দার বললো—বসুন। শুভ তো?

মঙ্গল ডাকু আসন গ্রহণ করবার পূর্বেই আসন গ্রহণ করলো ঝাঁম সর্দার।

মঙ্গল ডাকু এবার আসন গ্রহণ করলো।

বনহুর একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার দেহে সম্পূর্ণ কোচওয়ানের ড্রেস। মুখ তুলে বললো—সর্দার, ইনি আমার কাকা হন।

কায়েস মাথা দুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলো, তারপর বললো—যাও, তোমার কাকার জন্য ভাল খাবার আর পানীয় নিয়ে এসো।

আচ্ছা সর্দার। কথাটা নত মস্তকে বলে বেরিয়ে গেলো বনহুর।

একটু পরে সোহরাব আর মাহমুদের হাতে নানাবিধ খাদ্যসম্ভার নিয়ে বনহুর প্রবেশ করলো, তার হাতেও ফলমূলের ঝুড়ি।

বনহুর মঙ্গল ডাকুর সম্মুখে খাদ্যদ্রব্যগুলো সাজিয়ে রাখলো।

কায়েস বললো—বন্ধু আরম্ভ করুন।

মঙ্গল ডাকু গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো।

অবাক হয়ে তার খাওয়া দেখতে লাগলো কায়েস, সোহরাব আর মাহমুদ। বনহুর অনুগত দাসের মত জড়োসড়ো হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

কায়েস নিজে পরিবেশন করতে লাগলো—আপনি লজ্জা করবেন না যেন, আমার বাড়িতে কোনোদিন অতিথির অনাদর হয় না।

বনহুর হাতের মধ্যে হাত কচলাতে কচলাতে বললো হাঁ আমাদের সর্দারের এখানে শত্রুমিত্র সবাই সমান। সবাই সমান যত্ন লাভ করে থাকেন। কাকা, আপনি যতদিন খুশি আমাদের সর্দারের বাড়ি থাকতে পারেন, কোনো অসুবিধা হবে না।

মঙ্গল ডাকুর মুখে হাসি ফুটলো।

কায়েস বললো—হাঁ, আপনি যতদিন থাকতে চান থাকতে পারেন, এতে আমার কোনো আপত্তি হবে না।

বললো বনহুর—অতিথি-যত্ন আমার মালিকের নেশা।

মঙ্গল ডাকুর খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো, মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য আর ফলমূল উদরপূর্ণ করে তার দেহ পূর্বের ন্যায় সবল, সতেজ হয়ে উঠলো, বললো সে—আমাকে কয়েকদিন থাকতে হবে বলেই তো আমি এসেছি। বনহুরকে দেখিয়ে বললো—আমার ভাতিজার সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা কিনা?

বনহুর মঙ্গল ডাকুর কথায় উৎসাহ নিয়ে বললো—আমার কাকা ঠিক বলছেন; বহুদিন পর কাকাকে পেয়ে আমি অনেক খুশি হয়েছি।

হাঁ, তোমার কাকা আমারও বন্ধু হলো আজ থেকে—রহমত?

বলুন সর্দার?

একে থাকার জন্য পাশের কামরাটা খুলে দাও।

আচ্ছা সর্দার।

মঙ্গল ডাকুকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—আসুন কাকা, আপনার বিশ্রামের দরকার।

উঠে পড়লো মঙ্গল ডাকু—চলো।

পাশের কক্ষের দিকে এগুলো বনহুর, তাকে অনুসরণ করলো মঙ্গল ডাকু।

মঙ্গল ডাকু জানে না, কার কবলে সে পড়েছে—যে কোনো মুহূর্তে ওকে কুকুরের মত হত্যা করতে পারে বনহুর, কিন্তু এতো সহজে সে কাউকে হত্যা করে না। সিংহ যেমন মেষশাবক নিয়ে খেলা করে তেমনি দস্যু বঁনহুর খেলা শুরু করেছে মঙ্গল ডাকুকে নিয়ে।

❑

হঠাৎ নূরীর নিরুদ্দেশে ফুলমিয়াও বেশ ঘাবড়ে গেছে। নূরীর জন্যই ফুলমিয়া রয়ে গিয়েছিলো এখানে, মরিয়ম বেগম আর সরকার সাহেবের অপরিসীম স্নেহ পেয়ে নিজকে ধন্য মনে করেছিলো। ভেবেছিলো, য্যক তার লাঠিয়াল জীবনে এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। ভালই হয়েছে তার, আর তাকে পেটের দায়ে কু'কর্ম করতে হবে না।

কিন্তু নূরী যেদিন থেকে চৌধুরী বাড়ি ত্যাগ করে চলে গেলো, সে দিন থেকে ফুলমিয়াও যেন কেমন একা একা হয়ে পড়লো, সবসময় বিষণ্ন মনে বসে বসে ভাবতো। একবার কোনোক্রমে বাবু এসে পড়লে হয়—সে আর থাকবে না এখানে, চলে যাবে তার কাছে।

কিন্তু ফুলমিয়ার চলে যাওয়া আর হলো না, ফুলকে হারিয়ে নূর ফুলমিয়াকে পেয়ে বসলো। সব সময় ফুলমিয়ার কাছে ছাড়া তার চলতো না, স্কুলে যাবে ফুলমিয়ার সঙ্গে; মাঠে খেলা করবে—সেখানেও ফুলমিয়াকে যেতে হবে। বাগানে বসবে—সেখানেও ফুলমিয়াকে চাই। এক সময় সরকার সাহেব ছিলেন নূরীর সঙ্গী-সাথী সব কিছু, আজকাল সরকার সাহেব বড় একটা নড়াচড়া করতে পারতেন না। আগের মত তেমন মনের উৎসাহও নেই আর তার মধ্যে। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন আজকাল। বয়স তো তাঁর কম হয়নি, প্রায় পঁয়ষট্টির কাছাকাছি। শিথিলতা এসে গেছে তাঁর জীবনে এখন নূরের সঙ্গে তেমন করে আর ছুটতে পারেন না তিনি, হাসতেও পারেন না আর আগের মত প্রাণ খুলে। নূর তাই সরকার সাহেবের নিকট হতে সরে পড়েছিলো ধীরে ধীরে, পেয়েছিলো ফুলকে। অবশ্য ফুল থাকাকালেও ফুলমিয়ার সঙ্গে নূরকে আকৃষ্ট করেছিলো। ফুল মিয়া নূরকে কাঁধে করে, কখনও বা দোলনায় দোলা দিয়ে নানাভাবে খেলায় উৎসাহ

জোগাতো। স্কুলে যাবার সময় নূরের বই-পুস্তকের ব্যাগটা হাতে করে বয়ে নিয়ে যেতো ফুলমিয়া, আবার ফিরিয়ে আনতো স্কুল ছুটির পর।

আজকাল ফুলমিয়ার সঙ্গে নূরের এক গভীর বন্ধুত্ব ভাব জমে উঠেছিলো।

তাই ফুলমিয়া আর চলে যেতে পারে না চৌধুরী বাড়ি থেকে। সে চৌধুরী বাড়িরই একজন হয়ে যায়।

মনিরার নির্দেশে ফুলমিয়াকে ড্রাইভ শেখানো শুরু হলো।

অল্প দিনের মধ্যেই ফুলমিয়া দক্ষ ড্রাইভার বলে সুনাম অর্জন করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনোযোগসহকারে ড্রাইভ শিখতে লাগলো সে।

আজকাল চৌধুরী বাড়ির একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হয়ে উঠেছে ফুলমিয়া। চৌধুরী বাড়ির ভালমন্দ সব ফুলমিয়া অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে।

নূরের মুখের দিকে তাকিয়ে মনিরা রাগ-অভিমান মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছিলো কিন্তু পারেনি, সব সময় মনে হচ্ছিলো—তার স্বামী কি করে এমন অসৎ চরিত্র হতে পারে। ক্ষমা সে করতে পারে না কোনোদিন বনহুরকে।

প্রতিদিন মনিরা স্বামীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে চলেছে, একবার এলে তাকে দেখে নেবে মনিরা এতো অধঃপতনে সে গেলো কি করে। কার দোষ—বনহুরের না ফুলের? মনিরা নিজ মনকে কতবার প্রশ্ন করেও কোনো সমাধান খুঁজে পায়নি।

মনিরা যখন স্বামীর প্রতি ক্রুদ্ধ ভাব নিয়ে অহরহ দগ্ধীভূত হয়ে চলেছে তখন তার স্বামী এক অসহায়া নারীর স্বামীর সন্ধানে ব্যাপৃত। কৌশলে সে মঙ্গল ডাকুকে হাতের মুঠার মধ্যে এনেছে, এবার তার কাছে সুভাষিণীর সন্ধান চায় বনহুর। কোনোরকমে একবার জানতে পারলে তার বাসনা সিদ্ধ হবে।

মঙ্গল ডাকু সমাদরের অভাব নেই।

সব সময় রহমত তাকে আদর-যত্নাকরে চলেছে। পাশে পাশে থাকে সর্বক্ষণ—কখন কি প্রয়োজন হয় তাই।

ঝাঁম সর্দার কায়েস মাঝে মাঝে এসে বসে মঙ্গল ডাকুর কাছে, নানারকম গল্প করে।

একদিন মঙ্গল ডাকু রহমতবেশী বনহুরকে বললো—এই রহমত, একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করবো, সঠিক জবাব দিবি?

মাথা নীচু করে হাতের মধ্যে হাত কচলায় রহমত—বলুন কাকা?

হাঁ, তুই আমাকে কাকা বলেই ডাকবি।

আপনি আমাকে যেভাবে ভালবাসতে শুরু করেছেন তাতে নিজ কাকার চেয়েও আপনাকে বেশি মনে হয়। বাবা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে আপনাকে।

বেটার স্পর্ধা দেখো, কাকা বলেই রক্ষা পেয়েছিস। বাবা বলে আমাকে একে বারে কিনে নিতে চাস, তাই না?

না কাকা, আমার সাধ্য কি আপনাকে কিনে নেবো। তবে সব আপনার দয়া।

শোন্ বেটা?

বলুন স্যার?

আবার স্যার বলছিস---

মাফ করবেন, ভুল হয়েছে। বলুন কাকা?

আমাকে তোদের সর্দার রোজ যে ভারী আদর-যত্ন করে খাওয়াচ্ছে দামী দামী সব খাবার—এতোসব পায় কোথা থেকে।

কাকা, এসব তো সামান্য। আমাদের সর্দার যা পায় যদি দেখতেন তবে আপনার চোখে ধাঁ ধাঁ লেগে যেতো।

বলিস কি রহমত? কথাটা শুনেই মঙ্গল ডাকুর চোখ জ্বলে উঠে যেন।

বলে রহমত—আপনি আবার সর্দারকে বলে দেবেন না তো?

না না, বলবো কি—তুইতো আমার চাকর বেটা।

শুধু চাকর নই কাকা, আপনার গোলাম।

বেটা মুর্খ, জানিস না চাকর আর গোলাম এক কথা?

কাকা, অতোসব বুঝি না কিনা।

বল্ এতো সব পায় কোথায় তোদের সর্দার?

রহমতবেশী বনহুর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নয়। তারপর চাপা গলায় বলে—আমাদের সর্দার ডাকু।

কি বললি? তোদের সর্দার ডাকু?

কাকা আস্তে কথা বলেন। হাঁ, আমাদের সর্দার শহরের সেরা ডাকু, তাই তার টাকা-পয়সার অভাব হয় না কোনোদিন।

তাই না কি?

হাঁ কাকা। একটু থেমে পুনরায় বললো রহমত—কাকা, আপনার চেহারা দেখে আমার মনে হয় আপনি আমাদের সর্দার হলেও খুব ভাল হয়।

মুহূর্তে মঙ্গল ডাকুর বিকৃত বীভৎস মুখে খুশির আভাস ফুটে উঠলো—আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ওকে। বললো মঙ্গল ডাকু—রহমত, তোর কথাটা আমার অত্যন্ত মনে ধরেছে।

কাকা, আপনার মত ভাল মানুষ আমাদের হলে আমরা অনেক আরাম পেতাম। জানেন কাকা, আমাকে এই সর্দার কেন রেখেছে?

তা কেন রেখেছে তোকে? ডাকাতি করার জন্য বুঝি?

না কাকা, আমায় নিয়ে আর একটা ব্যবসা চালায়।

তাই না কি?
হাঁ কাকা, আমাদের সর্দারের বড় বদ-অভ্যাস আছে।
বদ অভ্যাস?
হাঁ। মেয়েছেলের লোভ---কথার ফাঁকে বনহুর তীক্ষ্ণ নজর ফেলে মঙ্গল ডাকুর মুখে।
কপালে একটা চোখ, চোখটা জ্বলে উঠে যেন দপ করে। বিকৃত মুখে লালসার হাসি ফুটে উঠে, বলে সে আগ্রহ ভরে—তুই বুঝি মেয়ে আমদানি করিস্?
কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে রহমত—করি কিন্তু একটাকেও সর্দার আমার হাতে ছেড়ে দেয় না। দেখুন কাকা, খবরদার এসব কথা যেন সর্দার জানতে না পারে, তাহলে আমার মাথাটা যাবে।
বলবো না, তবে একটা কাজ করতে হবে তোকে—যদি আমার কাজ না করবি তবে সবকথা আমি বলে দেবো তোদের সর্দারকে।
বলুন কাকা, কি কাজ করতে হবে?
আমি তোদের সর্দার হবো, বুঝলি?
তা তো অনেক আগেই বুঝেছি কাকা।
এখন থেকে যেসব মেয়ে তুই ধরে আনবি প্রথমে আমার কাছে নিয়ে আসবি তারপর পৌঁছে দিবি তোদের সর্দারের কাছে।
তাহলে আমার কি লাভ হচ্ছে?
তোকে ফাঁকি দেবো না রে, তোকে ফাঁকি দেবো না।
কাকা, দস্যু বনহুরের নাম শুনেছেন?
দস্যু বনহুর? মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠলো মঙ্গল ডাকুর, দাঁতে দাঁত পিষে বললো—দস্যু বনহুর আমার সর্বনাশ করেছে।
বলেন কি কাকা, দস্যু বনহুরকে আপনি দেখেছেন?
হাঁ, শুধু দেখিনি, তার সংগে লড়াই করেছি।
অবাক হয়ে বলে রহমত —দস্যু বনহুরের সঙ্গে আপনি লড়াই করেছেন?
কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না তোর?
কাকা, শুনেছি দস্যু বনহুরকে নাকি কেউ কোনোদিন দেখেনি।
আমি তাকে নিজের চোখে দেখেছি।
কেমন দেখতে সে? খুব বুঝি ভয়ঙ্কর—আপনার চেয়েও কুৎসিত?
রেগে গেলো মঙ্গল ডাকু—আমি বুঝি কুৎসিত?
না কাকা, মানে আপনার মত সুন্দর না কি দস্যু বনহুর?

গর্ব ভরে বললো মঙ্গল ডাকু এবার—আমার চেয়েও সে খারাপ। একটা ঝড়ের মত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললো—আমাকে সে সর্বহারা করেছে। জানিস্ রহমত, আজ আমার এ অবস্থা কেন?

এতোক্ষণে বনহুরের মনে একটা খুশির উৎস বয়ে যায়, পাশের গেলাসটা শরাবপূর্ণ করে বলে—কাকা ,গলাটা আপনার শুকনো লাগছে, একটু ভিজিয়ে নিন। বাড়িয়ে ধরলো গেলাসটা রহমত মঙ্গল ডাকুর মুখের কাছে।

মঙ্গল ডাকু তার এক হস্ত দ্বারা গেলাসটা নিয়ে শরাবটুকু ঢক ঢক করে গিলে ফেললো।

রহমত তাড়াতাড়ি গেলাসটা মঙ্গল ডাকুর হাত থেকে নিয়ে টেবিলে রাখলো, তারপর বললো—বলুন কাকা, আজ আপনার এ অবস্থা কেন?

ঐ শয়তান বদমাইশ দস্যু বনহুরের জন্যই আমার এ অবস্থা হয়েছে—আমিও সর্দার, বুঝলি?

আপনি সর্দার?

হাঁ, আমি মঙ্গল ডাকু।

আপনি—আপনি মঙ্গল ডাকু? বনহুর এমন মুখোভাব করলো যেন সে অবাক হয়েছে চরম আকারে।

মঙ্গল ডাকুর মনে তখন জোশ এসে গেছে, বললো সে—হাঁ, আমিই ঝাঁম জঙ্গলের অধিপতি সর্দার মঙ্গল ডাকু। ঐ শয়তান আমার সর্বনাশ করেছে। আমার বন্দীদের নিয়ে পালিয়েছে, আমার আস্তানা বোমা দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমার এ চরম অবস্থা করেছে--

দস্যু বনহুর আপনার এ অবস্থা করেছে ! কি দুর্দান্ত ডাকু—কি ভয়ঙ্কর ডাকু তবে দস্যু বনহুর—আমি ভাবতে পারছি না।

ঠিক্ বলেছিস রহমত, দস্যু বনহুরকে পেলে আমি তার হাড্ডি ছিড়ে মাংস কামড়ে খাবো।

কাকা, আপনার বন্দীদের মধ্যে সব বুঝি পুরুষ মানুষ?

না, অনেক মেয়ে ছিলো—অনেক সুন্দরী মেয়ে। সব মেয়েকে ঐ শয়তান হরণ করে নিয়ে গেছে।

বললো রহমত—চোরের উপর বাটপারি করেছে বেটা।

কি বললি?

না কিছু না, বলছিলাম কি, অতো মেয়ে আপনি কোথায় পেয়েছিলেন কাকা?

আমার অনেক অনুচর ছিলো, তাদের শক্তিবলেই ওদের লাভ করেছিলাম।

সবগুলো মেয়েই বুঝি ঝাঁম শহরের?

ঝাঁম শহরের ছিলো বেশি, আর বিভিন্ন দেশেরও ছিলো।

বাঙালী মেয়ে ছিলো কি? কাকা, বাঙালী মেয়েদের যদি একবার দেখতেন?

হেসে বললো মঙ্গল ডাকু—বাঙালী মেয়ে ছিলো দু'জন—তাদের একজন মরে গিয়েছিলো আর একজন ছিলো জীবিত।

বলেন কি কাকা. বাঙালী মেয়েও ছিলো তবে?

হাঁ, একজন জীবিত ছিলো।

তাকেও বুঝি নিয়ে গেছে দস্যু বনহুর?

তাকেও সে নিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ রহমত চিন্তা করলো মাথা নীচু করে, তারপর বললো—বাঙালী মেয়ে দুটিকে কোথা হতে এনেছিলেন কাকা?

সে কথা আর শুনে কি হবে বল্?

বলুন না কাকা, আমার বড্ড শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

মঙ্গল ডাকু বললো—দে, শরাব দে তবে আর এক গেলাস।

তাড়াতাড়ি আর এক গেলাস শরাব ঢেলে দ্রুত বাড়িয়ে ধরলো মঙ্গল ডাকুর মুখের কাছে—নিন।

মঙ্গল ডাকু শরাবের গেলাস উজাড় করে রহমতের হাতে দিলো—নাও রাখো।

রহমত গেলাসটা নিয়ে রাখলো, মঙ্গল ডাকু বলতে শুরু করলো—বেশ কিছুদিন আগে আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম বিদেশী সওদাগরের বেশে। কয়েকজন অনুচরও ছিলো আমার সঙ্গেই, অল্পদিনেই বহু টাকা-পয়সা আর ধন-রত্ন আমার হাতে আসে। অনেক মেয়েও আমি পেয়েছি বাংলাদেশে, ভোগ করেছি খুশি মত। ঐ সময় বাসবপুর বলে একটা জায়গা আছে, সে জায়গার জমিদারের মেয়ে আমার নজরে পড়ে—অমন মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি, অপূর্ব খাসা মেয়ে—যেমন চেহারা তেমনি যৌবন---

বলেন কি কাকা?

হাঁ ঠিক বলছি, যেন হুরপরী।

তারপর কাকা?

তারপর মেয়েটাকে পাবার জন্য আমি বাসবপুরের জমিদারের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুলি, বন্ধু হয়ে প্রবেশ করি অন্তঃপুরে। কিন্তু পরে জানতে পারি, মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে।

হায় কাকা,তাহলে তো সব আশা মাঠে মারা গেলো?

না না তা যাবে কেন, একদিন রাতের অন্ধকারে বাসবপুরে হানা দিলাম, হত্যা করলাম বাসবপুরের জমিদার ও তার স্ত্রীকে। হত্যা করলাম তার

বাড়ির সবাইকে কিন্তু যার জন্য এতোগুলোকে খতম করলাম তাকে পেলাম না---

পেলেন না কাকা?

পাবো না আমি? আমার নাম মঙ্গল ডাকু, একটা চাকরের কাছে জানতে পারলাম, মধুপুরে মেয়ের শ্বশুর বাড়ি। মধুপুরে আছে সে। আমি মধুপুরে হানা দিয়ে সুভাষিণীকে চাইলাম। আমাকে ওরা বাধা দিলো—আমি হত্যা করলাম সুভাষিণীর শ্বশুর বাড়ির বাধাদানকারীদের।

সবাইকে আপনি হত্যা করেছেন কাকা?

হাঁ, কাউকে বাদ দেইনি---

সুভাষিণীর স্বামীকেও আপনি হত্যা করেছেন কাকা?

ঐ বেটাকে আমি হত্যা না করে বন্দী করে নিয়ে আসলাম, কিন্তু বেটা পালিয়েছে।

পালিয়েছে?

কিন্তু পালিয়ে লাভ করতে পারেনি, সুভাষিণীকে আমি নিয়ে এসেছিলাম আমার ঝাঁম আস্তানায়।

সুভাষিণীর স্বামী তাহলে ঝাঁম জঙ্গলে এসে পালিয়েছে কি?

না না, সে তো খসে পড়েছে বাংলাদেশেই---

মুহূর্তে রহমতবেশী বনহুরের চোখ আনন্দ দীপ্ত হয়ে উঠলো। বললো তাহলে সে আর সুভাষিণীর সন্ধান পায়নি?

পাবে কোথায়, সে রইলো বাংলাদেশে আর সুভাষিণী রইলো ঝাঁম জঙ্গলে।

বড় আফসোস কাকা, সুভাষিণীকে আপনি হারিয়েছেন।

হাঁ আফ্‌সোসই বটে, মেয়েটাকে পেলাম কিন্তু রাখতে পরালাম না।

কাকা?

বল্ কি বলতে চাস্?

কাকা, মেয়েটার আপনি সর্বনাশ করেছিলেন?

সর্বনাশ? এ তুই কি বলছিস্ বেটা?

বলছি কি কাকা, মেয়েটার মানে—মানে সুভাষিণীর ইজ্জৎ নষ্ট করেছিলেন?

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো মঙ্গল ডাকু—যেন সাক্ষাৎ শয়তান মূর্তি, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—আমার হাতে যে মেয়ে এসেছে কেউ সতীত্ব নিয়ে ফিরে যেতে পারেনি। প্রত্যেকটা মেয়েকে আমি অঙ্গশায়িনী করেছি--- হাঃ হাঃ হাঃ, কেউ উদ্ধার পায়নি আমার হাত থেকে, কাউকে আমি রেহাই দেইনি---

উঃ কি ভয়ঙ্কর কথা, সুভাষিণীর জীবনটাও তাহলে বিনষ্ট করেছো, পাপিষ্ঠ শয়তান—সঙ্গে সঙ্গে বনহুর পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে চেপে ধরলো মঙ্গল ডাকুর বুকে।

হঠাৎ রহমতের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন দেখে ভড়কে গেলো মঙ্গল ডাকু—তবে ক্ষণিকের জন্য, পর মুহূর্তে বললো—বেটা, তোর কি মাথা খারাপ হলো?

বনহুর দক্ষিণ হস্তে রিভলভার মঙ্গল ডাকুর বুকে চেপে ধরে বাম হস্তে পকেট থেকে একটা বাঁশী বের করে ফুঁ দিলো, অমনি কায়েস, সোহরাব আর মাহমুদ প্রবেশ করলো কক্ষমধ্যে।

কায়েসের দেহে ঝাঁম সর্দারের ড্রেস বিদ্যমান, সর্দারকে মঙ্গল ডাকুর বুকে রিভলভার চেপে ধরে রাখতে দেখে বুঝতে পারলো সে, সর্দারের অভিনয় শেষ হয়েছে। বললো কায়েস—সর্দার।

বনহুর রিভলভার উদ্যত রেখে বললো—কায়েস, যা জানবার ছিলো জানা হয়ে গেছে।

একি! মঙ্গল ডাকু অবাকই শুধু হয়নি, একটু পূর্বের রহমতের গলায় এমন গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বর তাকে স্তব্ধ করে দিলো, ঝাঁম সর্দারই রহমতকে সর্দার বলছে—সব যেন ঘোরালো লাগছে মঙ্গল ডাকুর কাছে।

বনহুর বললো—সুভাষিণীকে নিয়ে এসো সোহরাব।

মঙ্গল ডাকু চমকে উঠলো, সুভাষিণী এখানে আসবে কি করে? তাকে তো ঝাঁম জঙ্গল থেকে দস্যু বনহুর নিয়ে গেছে অন্যান্য বন্দীর সঙ্গে--

মঙ্গল ডাকুর চিন্তায় বাধা পড়ে, সোহরাব বেরিয়ে য়ায়।

একটু পরেই ফিরে আসে সোহরাব—তার সঙ্গে সুভাষিণী।

মঙ্গল ডাকুকে লক্ষ্য করে বলে বনহুর—দেখো দেখি একে চিনতে পারো কিনা?

মঙ্গল ডাকুর দৃষ্টি সুভাষিণীর উপর পড়তেই তার চোখ দুটো ক্ষুধিত শার্দুলের মত জ্বলে উঠে, তীব্র কণ্ঠে বলে—তুমি এখানে এলে কি করে?

সুভাষিণী বিষধর নাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। মঙ্গল ডাকুর কুৎসিত বীভৎস চেহারা তার দেহে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়।

বনহুরের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠে, চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। দাঁত পিষে বললো—তোমার যমদুত ওকে এখানে এনেছে।

মঙ্গল ডাকুর মধ্যে জেগে উঠে এক পশুপ্রাণ, বনহুরের হাতখানা সরিয়ে দিয়ে রুখে দাঁড়ায়—বল কে তুই?

বনহুর বাম হস্তে টিপে মঙ্গল ডাকুর গলাটা, দক্ষিণ হস্তে রিভলভার ওর বুকে পুনরায় চেপে ধরে—আমার পরিচয় জানতে চাও?

হাঁ, বল্ তুই কে? এতোবড় সাহস তোর—মঙ্গল ডাকুর মুখের শিকার কেড়ে এনেছিস্?

শয়তান, দস্যু বনহুর তোমার মুখের শিকার কেড়ে এনেছে?

কোথায় সেই পাপিষ্ঠ?

মঙ্গল ডাকু কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে কায়েস ওর বুকে ছোরাবিদ্ধ করতে উদ্যত হলো। বনহুর বাধা দিয়ে বললো—আরও পরে।

বনহুর সুভাষিণীর হস্তে রিভলভার গুঁজে দিয়ে বললো—তুমি ওকে ওর পাপের সমুচিত শাস্তি দাও সুভাষিণী। তাহলে একটু শান্তি পাবে।

সুভাষিণী বলে উঠে—তুমি আমাকে উদ্ধার করেছো, তুমিই ওকে শাস্তি দিয়ে আমাকে শান্তি দাও।

মঙ্গল ডাকু অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে—তুই তবে দস্যু বনহুর?

হাঁ কাকা, আমিই তোমার বন্ধু দস্যু বনহুর---

এ্যাঁ, কি বললে?

কথা শেষ হয় না মঙ্গল ডাকুর, বনহুরের রিভলভার গর্জে উঠে।

তীব্র একটা আর্তনাদ করে ভূতলে লুটিয়ে পড়ে মঙ্গল ডাকু। তার একচক্ষু দিয়ে গড়িয়ে পড়ে তাজা লাল রক্ত, চোখের ভিতর দিয়ে গুলীটা বেরিয়ে যায় মাথার পিছন অংশ গুড়ো করে নিয়ে।

ভীমকায় একটা গরিলার দেহের মত স্থির হয়ে আসে মঙ্গল ডাকুর দেহটা। রক্তে ভিজে উঠে শুকনো মেঝের খানিকটা অংশ।

বনহুর স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে বলে—পৃথিবীর বুক থেকে একটা জীবন্ত শয়তান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।

❑

সর্দার, আমরা কবে কান্দাই রওয়ানা দেবো কিছু মনস্থ করেছেন কি? কথাটা বলে একপাশে দাঁড়ালো কায়েস।

বনহুর শয্যায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বললো—হাঁ করেছি। কারণ ঝাঁম শহরের কাজ আমাদের শেষ হয়েছে। আগামী সপ্তাহেই আমরা রওয়ানা দেবো। একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বনহুর।

কায়েস বলে আবার —সুভাদিদি কি আমাদের সঙ্গেই যাবেন?

তা'ছাড়া তো কোনো উপায় নেই কায়েস।

কিন্তু---

না, তাকে আস্তানায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

তবে কোথায় রাখবেন তাকে?

কান্দাই শহরে আমাদের যে পুরোন আস্তানা আছে সেখানে তাকে রাখলেই চলবে। হাঁ, এক কাজ করতে হবে কায়েস, সুভাকে একা সেখানে রাখা সমীচীন হবে না। নাসরিনকে তার কাছে থাকার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

হাঁ সর্দার, সেভাবেই কাজ করতে হবে, না হলে সুভাদিদি একা সেখানে থাকবে কি করে?

শুধু নাসরিনই নয়, তোমাদের কয়েকজনকেও থাকতে হবে। অবশ্য কয়েকদিনের জন্য, তারপর আমি আস্তানার কাজ শেষ করে সুভাষিণীকে নিয়ে বাংলাদেশের দিকে রওয়ানা দেবো। যতক্ষণ তাকে তার স্বামীর হস্তে পৌঁছে দিতে সক্ষম না হয়েছি ততক্ষণ আমার স্বস্তি নেই।

কিন্তু তার স্বামী যদি তাকে গ্রহণে আপত্তি করে বসে? কারণ মেয়েরা যদি একবার হরণ হয় বা গৃহত্যাগ করে তাহলে তাকে কোনো স্বামী আর গ্রহণ করতে চায় না।

তা চায় না বটে, কিন্তু কোনো নারীকে যদি কোনো দুষ্টলোক জোরপূর্বক চুরি করে নিয়ে যায় বা ধরে নিয়ে যায় তাতে সে নারীর কি অপরাধ বলো? সে তো সম্পূর্ণ নির্দোষ। কাজেই সুভাষিণী এ ব্যাপারে একেবারে নিষ্পাপ।

এরপর কায়েস আর কোনো কথা বলে না, বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াতেই বললো বনহুর—কায়েস, সুভাষিণীকে আপাততঃ কোনো কথাই বলো না, যা বলতে হয় আমিই বলবো।

আচ্ছা সর্দার। কথাটা বলে বেরিয়ে যায় কায়েস।

বনহুর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে, আবার তাকে যেতে হবে বাংলাদেশে। বাংলার মাটি আবার তাকে আহ্বান জানাচ্ছে, না গিয়ে উপায় নেই তার।

হঠাৎ শিয়রে একটা নিশ্বাসের শব্দ।

চমকে উঠে বনহুর, পাশ ফিরে তাকায় শিয়রে—একি তুমি।

হাঁ, আমি সুভা।

এতোরাতে তুমি?

কায়েসের সঙ্গে যখন কথা বলছিলে আমি সব শুনেছি।

মন্দ কথা কিছু বলিনি তো?

মন্দ বলোনি কিন্তু তুমি যা বলেছো তা সম্ভব নয়, কারণ আমি শুধু মেয়েই নই—হিন্দু কুলবধূ। জানো না, হিন্দু ধর্মের নীতি কুলবধূ যদি একবার কুলত্যাগী হয় তাহলে সমাজ তাকে কিছুতেই আশ্রয় দেবে না।

তুমি তাহলে কি বলতে চাও সুভাষিণী?

আমাকে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে আর লাঞ্ছিত করো না। আমি মরে গেছি আমাদের সমাজের কাছে।

সুভাষিণী।

ওগো তুমি তো জানো, আমি তো তোমার কাছে নতুন জন নই---সুভাষিণী বনহুরের পা দু খানা জড়িয়ে ধরে।

দ্রুত উঠে বসে পা সরিয়ে নেয় বনহুর—সুভাষিণী, তুমি সংযত হও।

পারবো না, পারবো না, আমি নিজেকে সংযত করতে পারবো না।

জানো তো আমি একজন দস্যু?

সে আমি প্রথম দিন তোমাকে দেখেই বুঝেছি। আমাকে ভালবাসতে পারবে না কোনো দিন তবে কেন এসেছিলে তুমি আমার জীবনে? কেন তুমি ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলে আমাকে?

বনহুর বিব্রত বোধ করলো, বললো সুভা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কথা দিচ্ছি, যেমন করে হোক তোমাকে তোমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করবো, তোমার স্বামীকেও পাবে তুমি।

আর যদি আমার সমাজ আমার স্বামী আমাকে গ্রহণ না করে তখন কি করবে তুমি?

দস্যু বনহুরের কথা বিফলে যাবে না সুভা, আমাকে তুমি জানো না—আমি যা বলবো তা করবোই। যাও, যাও সুভাষিণী, নিজের ঘরে যাও।

কিন্তু---

আর কোনো কিন্তু নয় যাও।

সুভাষিণী মন্থর গতিতে বেরিয়ে গেলো বনহুরের কক্ষ থেকে। একটা অতৃপ্ত করুণ নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেলো তার চলে যাওয়া পথের শেষে।

বনহুর আলো নিভিয়ে চোখ বুজলো।

❑

কান্দাই পৌঁছে বনহুর সুভাষিণীসহ তার শহরের আস্তানায় এসে উঠলো। অবাক হলো সুভাষিণী, এতোবড় বিরাট বাড়ি অথচ জনপ্রাণী নেই। প্রত্যেকটা কক্ষ রুচিশীল আসবাবে পরিপূর্ণ, সুন্দর সুন্দর মূল্যবান তৈলচিত্রে দেয়ালগুলো সজ্জিত। সুভাষিণীকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—এখানে কয়েকদিন তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে সুভা।

তুমি থাকবে না?

আমার অনেক কাজ আছে, তবে তোমার কাছে লোক থাকবে।

এতোবড় বাড়ি অথচ কাউকে দেখছি না তো?

দেখতে চাও? কথাটা বলে বনহুর হাতে তালি দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন জমকালো পোশাক পরা লোক এসে দাঁড়ালো কুর্ণিশ করে।

সুভাষিণী এদের দেখে চমকে উঠলো, ভীত নজরে তাকালো লোকগুলোর দিকে। জমকালো পোশাক পরা, মাথায় পাগড়ী, কোমরের বেল্টে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা, দক্ষিণ হস্তে চকচকে বর্শা।

বনহুর বললো—এরাই এ বাড়িটাকে রক্ষা করে।

সুভাষিণী কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর তাদের চলে যাবার জন্য ইংগিত করলো।

অনুচরগণ চলে গেলো।

বনহুর বললো—ভয় পেয়েছো সুভা?

না।

ওরাই তোমাকে এ বাড়িতে পাহারা দেবে। আর তোমার সাথী হিসেবে একটি মেয়েকে পাবে—যতদিন তোমাকে এ বাড়িতে থাকতে হবে সে থাকবে তোমার পাশে।

সুভাষিণী করুণ কণ্ঠে বলে—তুমি আর আসবে না?

কাজ সেরেই চলে আসবো, কারণ তোমাকে নিয়ে আমাকে যেতে হবে বাংলাদেশে, খুঁজে বের করতে হবে তোমার স্বামীকে। আমার বিলম্ব হতে পারে বাংলায়, কাজেই এদিকের কাজ সেরে তবে যাবো।

অল্পক্ষণ পর নানারকম খাদ্যসম্ভার নিয়ে একজন অনুচর হাজির হলো সেখানে।

বনহুরের ইংগিতে টেবিলে সাজিয়ে রেখে চলে গেলো।

এবার বনহুর সুভাষিণীকে খাবার জন্য বললো—খাও সুভা?

তুমি খাবে না?

বনহুর কিছু বলবার পূর্বেই সুভাষিণী একটা আঙ্গুরের ঝোপা নিয়ে তার মুখের কাছে এগিয়ে ধরে—খাও।

বনহুর হাত বাড়িয়ে আঙ্গুরের ঝোপাটা সুভাষিণীর হাত থেকে নিয়ে খেতে শুরু করে।

সুভাষিণীও খাবার তুলে নেয় হাতে।

এক সময় নাসরিন এসে পড়ে রহমানের সঙ্গে।

বনহুর তার সঙ্গে সুভাষিণীর পরিচয় করিয়ে দিলো—সুভা, একে তুমি নিজ বোনের মত মনে করতে পারো—এ থাকবে তোমার কাছে।

সুভাষিণী একজন সঙ্গিনী পেয়ে খুশি হলো।

বনহুর বিদায় নিলো সেদিনের মত।

❑

আস্তানার কাজ শেষ করতে লেগে গেলো কয়েকদিন। এবার বনহুর চঞ্চল হয়ে উঠলো মনিরা আর নূরীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। নূরকেও সে কতদিন দেখেনি, সেদিনও সে ওর সাক্ষাৎ পায়নি কারণ নূর মায়ের ঘরে ছিলো। সবচেয়ে বড় কর্তব্য তার—একবার মায়ের সঙ্গে প্রকাশ্য দেখা করা।

বনহুর তাই এবার স্বাভাবিক ড্রেসে চৌধুরী বাড়ি যাওয়া মনস্থ করে নিলো। তবে দিনের আলোতে নয়, রাতের অন্ধকারে তাকে যেতে হবে। না হলে হঠাৎ কোনো পরিচিত পুলিশ অফিসারের নজরে পড়ে গেলে একটু মুস্কিল হতে পারে।

বনহুর সন্ধার অন্ধকারে নিজের গাড়িখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো কিন্তু হঠাৎ মনে পড়লো নূর তাকে যদি চিনে ফেলে তখন কি হবে? না না তা হয় না, নূরের কাছে তাকে আত্মগোপন করে থাকতেই হবে। তার সন্তান নূর— নূর যেন তার মত ডাকু বা দস্যু না হয় সেই তো তার কামনা। বনহুর ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে ফেললো। তারপর ফিরে এলো আস্তানায়।

গভীর রাতে জমকালো ড্রেসে সজ্জিত হয়ে তাজের পিঠে চেপে বসলো। তাজ ছুটতে শুরু করলো কান্দাই শহর অভিমুখে। বন-জঙ্গল প্রকম্পিত করে বনহুরের অশ্ব ছুটছে।

চৌধুরী বাড়ি পৌঁছতে কয়েক ঘন্টা লেগে গেলো।

প্রথমে বনহুর নূরীর দরজায় মৃদু টোকা দিলো—ঠক্ ঠক্ ঠক্--

পুনঃ পুনঃ আংগুল দিয়ে আঘাত করছে বনহুর, একটা উদ্যম বাসনা তার মনকে চঞ্চল করে তুলেছে।

হঠাৎ বনহুর পিঠে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করে, চমকে ফিরে তাকায়।

পরবর্তী বই

ধূমকেতু

ধূমকেতু - ৩৪

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑
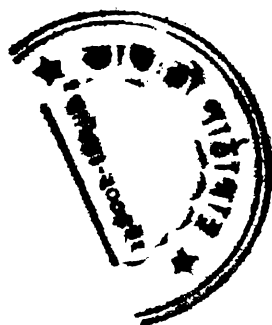
মুহূর্তে বনহুরের সুন্দর মুখে একটা বিব্রত ভাব ফুটে উঠে, বলে সে—মনিরা!

হাঁ, অমন চমকে উঠলে কেন?

মনিরা?

বলো এখানে কি করছিলে?

ঘরে চলো, সব তোমাকে বলবো।

না, আমি এখানেই জানতে চাই, তুমি একটা দাসীর দরজায় এভাবে কেন গোপনে আঘাত করছিলে?

বনহুর এমনভাবে অপদস্থ হবে ভাবতে পারেনি, মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে সে অপরাধীর মত।

মনিরা স্বামীর জামার আস্তিন ধরে সজোরে ঝাকুনি দিয়ে বলে—জবাব দাও, এখানে তোমার কি প্রয়োজন? এ ঘরে কি আছে—টাকা-পয়সা ধন-রত্ন যা তুমি হরণ করতে এসেছো? জবাব দাও? জবাব দাও, নইলে আমি চীৎকার করে সবাইকে ডাকবো। ধরিয়ে দেবো তোমাকে পুলিশের হাতে--

মনিরা শান্ত হও—চলো তোমার ঘরে, সব বলবো।

না, আমার ঘরে তোমাকে যেতে হবে না, চাই না আর তোমাকে।

মনিরা!

আমার নাম তুমি উচ্চারণ করো না, করো না বলছি।

বনহুর মনিরার হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরে —আমাকে মাফ করো মনিরা।

না, আমি তোমাকে কিছুতেই মাফ করবো না।

কি করবে আমাকে?

পুলিশের হাতে তোমাকে তুলে দেবো।

তাই দাও, তবু তুমি নূর আর আম্মার কাছে আমাকে অপদস্থ করো না। আমাকে---

কোনো কথা বলো না তুমি, কিছুই আমি শুনতেই চাই না।

মনিরা!

একবার বলেছি ও নাম তুমি উচ্চারণ করো না।

বেশ, আমি চলে যাচ্ছি।

হাঁ,তাই যাও। তোমাকে আমি আর চাই না, কারণ তোমার মত চরিত্রহীন---

মনিরা!

তুমি এতো ঘৃণ্য, এতো নীচ তুমি—ছিঃ ছিঃ ছিঃ একটা দাসীর সঙ্গে তোমার প্রেম--

মনিরা---

না না, চুপ্ করো, চুপ করো তুমি। তুমি শুধু দস্যুই নও—তুমি লম্পট, তুমি মাতাল, তুমি ব্যভিচারী---

গম্ভীর কঠিন হয়ে উঠে এবার বনহুরের মুখমণ্ডল। দৃঢ় চাপা কণ্ঠে বলে—মিথ্যা অপবাদ দিও না মনিরা।

আমার কাছে গোপন করতে চাইলেও গোপন নেই কোনো কথা। বলো, এর আগে ফুলের কক্ষে রাত কাটিয়ে যাওনি?

বনহুর এতোক্ষণে সব বুঝতে পারে, ব্যাপারটা তাহলে মনিরার কানেও গিয়েছিলো। ভুল তারই হয়েছিলো সেদিন। এবার বনহুর হেসে উঠে—লোকের কথা শুনে তুমি আমাকে অবিশ্বাস করেছো? মনিরা, ফুল শুধু দাসী নয়—সে আমার একজন---

বনহুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠে মনিরা—একজন বান্ধবী, তাই না?

মনিরা, অযথা তুমি আমাকে দোষারোপ করছো বা আমার উপর রাগান্বিত হচ্ছো।

বলো ফুলের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

কিছু না, আমার বিশিষ্ট অনুচরদের মধ্যে সেও একজন। তার কক্ষে আমার প্রয়োজন ছিলো, কারণ সে আমাকে অনেক ব্যাপারে সহায়তা করে থাকে।

বনহুরের কথায় মনিরার মনে চিন্তার ছাপ পড়ে, অনেকটা নরম হয়ে আসে সে, বলে মনিরা—ফুল তোমাকে কি ব্যাপারে সহায়তা করে শুনি?

আমাকে বিভিন্ন খোঁজ-খবর দিয়ে থাকে সে—ধরো তোমার কাছে আসা ব্যাপারেও সে আমাকে সহায়তা করে। আজও আমি তোমার ঘরে যাবো বলেই ওকে ডাকছিলাম, কারণ জানতে চাইছিলাম নূর তোমার ঘরে আছে, না মায়ের ঘরে?

সত্যি বলছো?

মৃদু হাসে বনহুর—মিথ্যা কোনোদিন বলেছি তোমার কাছে?

মনিরা অস্ফুট কণ্ঠে বলে —না।

চলো মনিরা, ঘরে চলো।

চলো।

স্বামীসহ মনিরা নিজের ঘরে ফিরে আসে।

আজ কতদিন থেকে মনিরার চোখে ঘুম ছিলো না, সব সময় দগ্ধীভূত হচ্ছিলো সে অন্তরে অন্তরে। প্রতিদিন সে স্বামীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতো। কখনও বা শুয়ে শুয়ে ভাবতো, কখনও বা মুক্ত জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকতো জমাট অন্ধকারের দিকে। ব্যথা-বেদনায় গুঁমরে মরতো, অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতো সে।

অন্যান্য দিনের মত আজও মনিরা মুক্ত জানালায় উন্মুখ হৃদয় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, অশ্ব-পদশব্দ তার কানে পৌছেছিলো। এ শব্দ যে তার অতি পরিচিত।

আশায়-আনন্দে বুকটা তার যেমন স্ফীত হয়ে উঠেছিলো, তেমনি রাগে—অভিমানে ভরে উঠেছিলো মনটা—যেমন করে হোক, আজ তার কাছে জেনে নেবে সেদিনের ব্যাপারখানা।

মুক্ত জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিলো অনেকক্ষণ কিন্তু কই সে তো এলো না ---তবে কি কোনো ভুল শব্দ তার কানে এসে পৌঁছেছে। হয়তো তাই হবে, নইলে এতোক্ষণ বিলম্ব করবে কেন?

এমন সময়ে হঠাৎ তার কানে গেলো নিচের তলায় ঠক্ ঠক্ শব্দ; অতি ধীরে মৃদু মৃদু শব্দ। মনিরার মনে সন্দেহের দোলা লাগলো। তবে কি তারই স্বামী আজ আবার ফুলের শূন্য কক্ষে আঘাত করছে। পা টিপে টিপে নিচে নেমে এলো মনিরা। সমস্ত চৌধুরী বাড়ি তখন ঘুমে অচেতন।

মনিরা নিচে নেমে এসে ফুলের দরজার দিকে তাকাতেই স্তব্ধ হয়ে গেলো, এ যে তার প্রতীক্ষিত জন—তার স্বামী। ধীরে ধীরে লঘু পদক্ষেপে ওর পিছনে এসে দাঁড়ালো।

তখনও বনহুর ফুলের বদ্ধ দরজায় টোকা দিয়ে চলেছে।

পিঠে হাত রাখলো মনিরা, রাগে-ক্ষোভে মনের মধ্যে তখন দাহ হচ্ছিলো তার।

বনহুর ফিরে তাকাতেই মনিরা দাঁত পিষে বলেছিলো—চমকে উঠলে কেন? কি করছিলে তুমি এখানে?

বনহুর জবাব দিতে পারেনি, বলেছিলো—চলো ঘরে চলো, সব বলবো তোমাকে। হয়তো বা বলতো তখন সব কথা কিন্তু বনহুর সামলে নিলো অল্পক্ষণে, মনিরার কাছে সে গোপন করে নিলো নূরী সম্বন্ধে আসল কথাটা। বললো, ফুল তার অনুচরদেরই মত একজন, কাজেই তার কাছে নানা রকম সহায়তা সে পেয়ে থাকে।

মনিরা সরল মনে বিশ্বাস করলো স্বামীর কথা। মনে যে সন্দেহের ছাপ পড়েছিলো, ধীরে ধীরে তা মুছে গেলো পরিষ্কার হয়ে। ভাবলো—তাইতো এমন কখনও হতে পারে না। এ তার মনের ভুল।

❑

স্বামীর বুকে মাথা রেখে মনিরা শুয়েছিলো।

ধীরে ধীরে ওর চুলে হাত বুলাচ্ছিলো বনহুর।

নির্জন কক্ষে জাগ্রত দু'টি প্রাণী।

বললো বনহুর—মনিরা, আমাকে একবার মাধবপুর যেতে হবে। হয়তো অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ হবে না।

মনিরা বললো—বাংলার অদূরে সেই মাধবপুর?

—হাঁ মনিরা, বাংলাদেশের কাছাকাছি মাধবপুর। আমার পুরানো আস্তানার সন্নিকটে।

কিন্তু কেন সেখানে যাবে বলো তো?

সে কথা আজ নয়, আর একদিন বলবো।

কবে বলবে বলো তো?

মাধবপুর থেকে ফিরে এসে।

মনিরা?

বলো?

অনেকদিন হলো মায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি। দেখা হয়নি নূরের সঙ্গে।

তুমি যদি বলো তবে মামীমাকে ডেকে আনি? আর নূরকে?

না না, নূরের সাক্ষাতে আমি যাবো না, বরং যদি পারো আমাকে নিয়ে চলো—নূরকে একবার দেখবো, দেখবো আম্মাকে।

নিজের জননী আর নিজ সন্তানকে তুমি চোরের মত চুপি চুপি দেখতে চাও?

মনিরা, আমাকে আর লজ্জা দিওনা। তুমি তো জানো, আমি তাদের কাছে কত বড় অপরাধী? কোন্ মুখ নিয়ে আমি তাদের সম্মুখে আত্মপরিচয় দেবো বলো?

তাহলে কাজ নেই দেখে।

ভাবছি যদি ফিরে না আসি আর---

মনিরা স্বামীর মুখে হাত চাপা দেয়—সব সময় তুমি অমঙ্গল কথা বলো। ওসব বললে আমি তোমাকে কিছুতেই মাধবপুরে যেতে দেবো না।

লক্ষ্মীটি বাধা দিও না আমাকে। বনহুর স্ত্রীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেললো।

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে বলে—যদি কথা দাও শীঘ্র ফিরে আসবে তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেবো।

হাঁ, তাই আসবো। মনিরা আম্মা আর নূরকে একবার দেখতাম।

এসো! মনিরা স্বামীকে সঙ্গে করে মায়ের কক্ষের দিকে এগোয়।

কক্ষের মাঝখানের দরজা মুক্তই ছিলো, সেইপথে কক্ষে প্রবেশ করে মনিরা, তার পেছনে বনহুর।

মনিরা অতি লঘু হস্তে মশারী তুলে ধরে, নিদ্রিতা জননীর মুখের দিকে নির্নিমেশ নয়নে তাকিয়ে থাকে বনহুর, পাশেই ঘুমিয়ে আছে নূর—সুন্দর ফুলের মত ছোট্ট একটা বালক।

বনহুর মায়ের পায়ের কাছে বসে পড়ে, মায়ের চরণে চুম্বন করে, তারপর বলে—চলো মনিরা।

মনিরা আর বনহুর বেরিয়ে আসে কক্ষ হতে।

বনহুর বলে—নূরের চেহারাটা রোগ রোগা লাগলো যেন, ওর তো কোনো অসুখ করেনি?

না, অসুখ করেনি তবে ফুলের জন্য সব সময় কাঁদাকাটি করতো তাই-

অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করে.বনহুর—ফুলের জন্য—তার মানে? চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে বনহুর, তীক্ষ্ণ নজরে তাকায় মনিরার মুখের দিকে।

মনিরাও দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, গম্ভীর গলায় বললো—ফুলকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি বাড়ী থেকে।

অকস্মাৎ অস্ফুট শব্দ করে উঠে বনহুর-কি বললে?

ফুলকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি!

ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে আসে বনহুরের—ফুলকে তুমি তাড়িয়ে দিয়েছো?

হাঁ।

এ তুমি কি বলছো মনিরা।

আমি ভুল করে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আমার সন্দেহ হয়েছিলো —সে দুষ্টচরিত্রা মেয়ে। আলীর মা আমাকে বলেছিলো, তুমি নাকি তার ঘরে---

মনিরা!

তাই তো আজও আমার সন্দেহ জেগেছিলো তোমার আচরণে। আমাকে তুমি মাফ করো।

এ তুমি কি করেছো মনিরা? কান্দাই শহরে সে কিছু চেনে না। কোথায় গেছে কে জানে! কতদিন আগে তাকে তুমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছো?

প্রায় তিন সপ্তাহ হবে।

বলো কি? একটু থেমে বলে আবার বনহুর—একটা নিরীহ নিষ্পাপ মেয়েকে তুমি এভাবে তাড়িয়ে দিতে পারলে?

আমি নিজেকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারিনি।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লো, দক্ষিণ হস্তে নিজের মাথার চুলগুলো টানতে লাগলো জোরে জোরে। অধর দংশন করতে লাগলো আপন মনে।

মনিরা বললো—একটা সাঁপুড়ে মেয়ের জন্য তুমি এতোখানি উতলা হবে ভাবতে পারিনি। গেলোই বা সে, তাতে ক্ষতি কি তোমার?

বনহুর কোনো জবাব দেয় না, উঠে দাঁড়ায় সে বলে—ফুল যদি ফিরে আসে আশ্রয় দিও মনিরা।

মনিরা কিছু বলবার পূর্বেই বেরিয়ে যায় বনহুর। অল্পক্ষণ পরই মনিরা শুনতে পায় দ্রুত অশ্ব-পদশব্দ খট্ খট্ খট্---ক্রমান্বয়ে শব্দটা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে—মুক্ত জানালার পাশ থেকে ফিরে আসে মনিরা।

❑

আস্তানায় ফিরে তাজের পিঠে থেকে নেমেই বনহুর নিজ কক্ষে প্রবেশ করে। দু'জন অনুচর তাজকে ধরে নিয়ে যায় অশ্বশালার দিকে। আর দু'জন অনুচর বনহুরের সঙ্গে এগিয়ে চলে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র উদ্যত করে।

বনহুর অনুচরদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলে—রহমানকে আমার বিশ্রামাগারে পাঠিয়ে দাও।

অনুচরদ্বয় চলে যায় নতমস্তকে কুর্ণিশ জানিয়ে।

বনহুর এগিয়ে চলে।

আস্তানায় প্রবেশ করার পরও তিনটি কঠিন গেট পেরিয়ে তবেই বনহুরের বিশ্রামাগার। প্রথম গেটের সম্মুখে আসতেই গেটটা দু'পাশে ফাঁক হয়ে গেলো, ঠিক যেন সুতীক্ষ্ণ কাঁটাখচিত দু'টি দেয়াল সরে গেলো দু'পাশে।

বনহুর প্রবেশ করতেই পুনরায় বন্ধ হয়ে গেলো গেটটা

দ্বিতীয় গেট কুমীরের হা-এর মত। বনহুর এগুতেই কুমীরের মুখ-গহ্বর দু'দিকে ফাঁক হলে গেলো, ভিতরে প্রবেশ করলো বনহুর। তৃতীয় গেটের সম্মুখে দু'জন উদ্যত রাইফেলধারী নিগ্রো পাহারা দিচ্ছে। সেকি ভীষণ চেহারা নিগ্রো অনুচরদ্বয়ের —যেন এক একটা যমদূত! বনহুর এগুতেই নত মস্তকে সসম্মানে সরে দাঁড়ালো।

বনহুর গেট পেরিয়ে নিজের বিশ্রামাগারে প্রবেশ করলো। এ কক্ষ এককালে দস্যু কালু খাঁর বিশ্রামকক্ষ ছিলো। এ কক্ষেই একদিন কালু খাঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলো। সেদিন বনহুর নিজের পরিচয় লাভ করেছিলো—সে কালু খাঁর সন্তান নয়---কালু খাঁ তার হস্তে একটি লকেটযুক্ত মালা দিয়ে বলেছিলো, এর মধ্যেই পাবে তুমি তোমার পরিচয়।

কালু খাঁর মৃত্যু ঘটেছিলো, বনহুর কেঁদেছিলো ভীষণভাবে। জীবনে বুঝি এমন করে সে কোনো দিন কাঁদেনি।

সেদিন একটি কোমল হাত তার মাথায় এসে পড়েছিলো।

চমকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেছিলো সে ঐ নূরীকে।

বলেছিলো নূরী—কেঁদো না হুর, বাপু চলে গেছে, আমি তো আছি তোমার পাশে---

বনহুর শয্যায় বসে পড়ে, চোখের সামনে ভেসে উঠে গত জীবনের প্রতিচ্ছবিগুলো।

রহমান প্রবেশ করে দাঁড়ায় একপাশে—সর্দার!

মুখ তোলে বনহুর।

রহমান বনহুরের মুখচোখের ভাব দেখে বুঝতে পারে, নিশ্চয়ই কোনো ঘটনা ঘটে গেছে, যার জন্য তাদের সর্দার বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

বনহুর বললো—রহমান, নূরী মনিরার কাছেই চৌধুরী বাড়িতে ছিলো—এ কথা তুমি জানো?

জানি সর্দার।

মনিরা কোনো কারণবশতঃ তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। জানি না সে এখন কোথায়। রহমান, কান্দাই শহরে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাকে সন্ধান করে খুঁজে বের করবার জন্য কয়েকজনকে পাঠিয়ে দাও।

সর্দার, অন্যান্যের সঙ্গে আমি নিজেও যাবো তার সন্ধানে।

যা ভাল বুঝ করো। আজ প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে সে চৌধুরী বাড়ি ত্যাগ করেছে।

তাহলে কোথায় গেলো সে? কান্দাই শহরের পথঘাট তো তার চেনা নেই।

হাঁ, সে কারণে আমি অত্যন্ত চিন্তিত আছি। রহমান, বিলম্ব করো না, এক্ষুণি তোমরা নূরীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো। যতদিন নূরীকে খুঁজে না পাওয়া যাবে ততদিন আমি মাধবপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারছি না।

আচ্ছা সর্দার, আপনার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ হবে।

রহমান বেরিয়ে গেলো।

বনহুর পায়চারি শুরু করলো কক্ষমধ্যে। নূরীর চিন্তা তাকে বেশ ভাবিয়ে তুললো। না জানি এখন সে কোথায় কেমন অবস্থায় আছে। যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

বনহুর একজন ফেরিওয়ালার বেশে সজ্জিত হয়ে নিলো। গোপনে সে আস্তানা ত্যাগ করে রওয়ানা দিলো কান্দাই শহর অভিমুখে।

শহরে পৌঁছে টাকা দিয়ে নানারকম খেলনা কিনে নিলো, তারপর অলিগলি, পথে পথে ফেরী করে বিক্রি করতে লাগলো—চাই খেলনা চাই—চুড়ি, ফিতা মাথার কাঁটা সব আছে—চাই খেলনা চাই—পুতুল, গাড়ী, চুড়ি, কাঁচি যা নেবেন সব পাবেন, চাই খেলনা চাই---

আপন মনে খেলনার ঝুড়িটি নিয়ে এগুচ্ছে বনহুর—নজর তার পথের চারদিকে। ছেলেমেয়ে সবাই ভিড় করে কিনছে, যে যা চায় তাই দিচ্ছে বনহুর নিজ হাতে। পয়সা যে দিচ্ছে নিচ্ছে, দেবার কথা যে ভুলে যাচ্ছে তার কাছে পয়সা চায় না সে, শুধু আপন মনে বলে চলেছে—চাই খেল্না চাই—চুড়ি, ফিতা, মাথার কাঁটা যা নেবেন সব পাবেন। চাই খেলনা চাই--

সারাদিন পথে পথে ঘুরে হয়রান-পেরেশান হলো বনহুর, পা ব্যথা হলো, শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে দর দর করে, সুন্দর মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে উঠেছে।

হতাশ হয়ে একটা গাছের নিচে বসে পড়লো বনহুর। অদূরে কতগুলো ছেলেমেয়ে খেলা করছে—স্কুল টিফিন হয়েছে তাই আপন মনে ছুটোছুটি করছে ওরা মাঠের মধ্যে।

হঠাৎ ওদিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলো বনহুর—একটা মোটরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ফুলমিয়া গাড়িতে হেলান দিয়ে, অদূরে ছেলেমেয়েদের খেলা দেখে হাসছে।

এমন সময় একটা ছেলে ছুটে আসে বনহুরের পাশে, এই, বল আছে তোমার কাছে?

চমকে উঠে বনহুর—এ যে তারই সন্তান নূর।

অবাক হয়ে তাকায় বনহুর নিজ সন্তানের মুখের দিকে। আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠো তার মুখ, নিজেকে সংযত রাখতে পারে না, অন্যান্য ছেলের মধ্য হতে ওকে কোলে তুলে নেয়, গালে একটা চুমু দিয়ে বলে—খোকা বল নেবে?

নূর অস্বস্তি বোধ করে, ফেরিওয়ালার আচরণ তার খারাপ লাগে। হঠাৎ ফেরিওয়ালা তাকে কোলে তুলে নিলো কেন? বলে সে—আমাকে নামিয়ে দাও।

বলো কি নেবে তুমি?

দূর থেকে ফুলমিয়া লক্ষ্য করছিলো, এগিয়ে আসে দ্রুত সে, বনহুরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রাগতকণ্ঠে বলে —ওকে কোলে করেছো কোন্ সাহসে?

বনহুর নিজের মুখের দাড়িতে ভালভাবে হাত বুলিয়ে বলে—কেন, দোষ কি বাবু?

তোমার সাহস তো মন্দ নয় ফেরিওয়ালা?

কেন বাবু, আমরা কি মানুষ না?

মানুষ তো সবাই, তা বলে তুমি একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে কোলে নেবে? ঠাই করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ফুলমিয়া ফেরিওয়ালার গালে।

নূরকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে হাসে ফেরিওয়ালা, তারপর বলে—যাও মাফ করে দিলাম। খোকা, কোন্ বলটা নেবে বলোতো?

নূর অবাক হয়ে গেছে—ফুলমিয়ার চড় খেয়েও ফেরিওয়ালার রাগ হলো না বরং তাকে বল নেবার জন্য অনুরোধ করছে। তার সম্মুখে ফেরিওয়ালার প্রসারিত হাত দু'টিতে কয়েকটা বল।

বললো আবার ফেরিওয়ালা—কোন্টা তোমার পছন্দ খোকা?

নূর আস্তে একটা বল তুলে নিলো হাতে।

হেসে বললো ফেরিওয়ালা—সাবাস!

ফুলমিয়া পকেট থেকে রুমাল বের করে রুমালের খুট থেকে পয়সা বের করতে করতে বললো—কত দিতে হবে বলের দাম?

ফেরিওয়ালা ফুলমিয়ার কথার কোনো জবাব না দিয়ে ঝুড়িটি কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেলো সেখান থেকে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ফুলমিয়া ফেরিওয়ালার চলে যাওয়া পথের দিকে।

নূর বল পেয়ে তো অনেক খুশি।

বাড়ি এসে নূর মাকে বললো—মাম্মি, দেখো কি সুন্দর বল!

মনিরা সন্তানকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে—এ বল তুমি কোথায় পেলে বাবা?

মাম্মি, এ বল আমাকে একটা ফেরিওয়ালা দিয়েছে।

দাম দিয়েছো?

ফুলমিয়া দিতে চাইলে সে নেয়নি। জানো মাম্মি, ফেরিওয়ালা আমাকে দেখেই আদর করে কোলে তুলে নিয়েছিলো, চুমু দিয়ে বলেছিলো, খোকা বল নেবে? অমনি ফুলমিয়া দৌড়ে গিয়ে খুব করে বকে দিয়েছিলো, ঠাই করে চড়ও বসিয়ে দিয়েছিলো একটা তার গালে।

কি বললে, ফুলমিয়া ফেরিওয়ালাকে চড় মেরেছিলো?

হাঁ খুব কষে মেরেছিলো—জানো মাম্মি, তবু ফেরিওয়ালা একটু কিছু বললো না, বরং হেসে বললো—যাও মাফ্ করে দিলাম। আর আমাকে এ বলটা দিলো সে—পয়সা নেয়নি।

মনিরা অবাক হয়, তক্ষুণি ফুলমিয়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করে।

ফুলমিয়া স্বীকার করে—হাঁ আপামণি, নূর মনি যা বলেছেন সত্যি কথা—লোকটা আশ্চর্য —আমার কঠিন হাতের চড় খেয়েও সে এতোটুকু ভড়কে গেলো না, হাসতে লাগলো যেন কিছু হয়নি।

মনিরা বললো—চড় দেওয়া তোমার অন্যায় হয়েছে ফুলমিয়া, কারণ সে যে তোমাকে পাল্টা জবাব দেয়নি তাই ভাগ্য। বরং সে বলটার মূল্য না নিয়ে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছে।

ফুলমিয়া নিজের ভুলের জন্য অনুতাপ বোধ করতে লাগলো, একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো নত মস্তকে।

বললো মনিরা—এরপর দেখা হলে ক্ষমা চেয়ে নিও ফেরিওয়ালার কাছে।

আচ্ছা আপামণি।

কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো ফুলমিয়া।

মনিরা ভাবতে লাগলো, কে সে ফেরিওয়ালা যার এমন অদ্ভুত আচরণ!

ওদিকে বনহুর ফেরিওয়ালারবেশে এগিয়ে যাচ্ছে রাজপথ ধরে—চাই খেলনা চাই, চুড়ি ফিতা মাথার কাঁটা চাই---

❑

রওশান রিজভীর প্রচেষ্টায় নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে একদিন জেল থেকে ছাড়া পেলো নূরী।

যখন নূরীকে মুক্তি দেওয়া হলো তখন নূরী অসহায়ার মত পথে এসে দাঁড়ালো, কোথায় যাবে সে। অসংখ্য জনতার ভিড়ে সে যেন সম্পূর্ণ একা।

নূরী যখন দুশ্চিন্তায় অস্থির তখন রওশান রিজভী এসে দাঁড়ালেন তার পাশে—কোথায় যাবে?

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললো নূরী—জানি না।

অবাক হয়ে বললেন রওশান রিজভী—সে কি, কোথায় যাবে জানো না?

শহরে তো আমার কোনো আত্মীয় নেই।

একটু চিন্তা করে বললেন রওশান রিজভী—তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমার বাসায় যেতে পারো?

অবিশ্বাস-ভরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো নূরী রওশান রিজভীর মুখের দিকে।

বুঝতে পারলেন রওশান রিজভী, মনে পড়লো তার নূরীর কেসের ঘটনাটা--বিশ্বাস করে সে গিয়েছিলো এক ভদ্রসন্তানের সঙ্গে কিন্তু তার পরিণাম কি ঘটেছিলো —যার জন্য নূরী বাধ্য হয়েছিলো তাকে নির্মমভাবে হত্যা করতে। নূরী তাকেও অবিশ্বাস করছে। এটা স্বাভাবিক—তার মন মানুষের প্রতি বিষিয়ে উঠেছে ঘৃণায়। রওশান রিজভী বললেন—তুমি যে ভয় বা আশঙ্কা করছো তা সম্পুর্ণ ভুল, আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো নূরী।

নূরী পুলিশ বিভাগের নিকটে নিজের নাম নূরী বলেই প্রকাশ করেছিলো। নাম গোপন করবার কোনোই দরকার বোধ করেনি সে। নূরী জানতে

পেরেছিলো এ লোকটার জন্যই সে আজ ফাঁসীর মঞ্চ থেকে ফিরে এলো। রওশান রিজভীর প্রচেস্টায় সে নবজীবন লাভে সক্ষম হয়েছে তাতে কোনো ভুল নেই।

রওশান রিজভীর সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলো নূরী—আজ তাই সে ফেলতে পারলো না তার কথাটা, রিজভীর গাড়িতে চেপে বসলো।

রওশান রিজভী তরুণ পুলিশ ইন্সপেক্টর, অবিবাহিত ভদ্র লোক। বাসায় তার একমাত্র মা আর দু'টি ঝি-চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। কাজেই কোনো অসুবিধা হলো না তার নূরীকে নিয়ে।

বাসায় এসে মাকে ডেকে বললেন রওশান রিজভী —মা, এ মেয়েটি বড় অসহায়া, একে তোমার স্নেহ দিয়ে গ্রহণ করো।

রওশান রিজভীর জননী প্রবীণা ভদ্রমহিলা—দয়ামায়ায় মন তাঁর পরিপূর্ণ। নূরীর সৌন্দর্য আর নম্রতা তাকে আকৃষ্ট করলো। তিনি নূরীকে সাদরে গ্রহণ করলেন—এই নির্জন অন্দর মহলে কন্যাসম একজন সঙ্গী পেয়ে বরং খুশিই হলেন তিনি।

মোহসিনা বেগমের স্নেহ-মাখা কথায় নূরীর মনে শান্তি এলো, একটা দুশ্চিন্তা ছিলো তার অন্তরে সেটা দূর হলো—যাক তবু একটা আশ্রয় হলো তার। এখন সে এ আশ্রয়ে থেকে অন্বেষণ করবে তার হুরকে। নিশ্চয়ই সে যখন জানতে পারবে নূরী চলে গেছে তখন খোঁজ করবে বনহুর তার।

একটা উদ্যম বাসনা নিয়ে নূরী রওশান রিজভীর বাড়িতে স্থান লাভ করলো।

নূরী চিরদিনই চঞ্চলা, মনিরা যেমন গম্ভীর শান্ত প্রকৃতির মেয়ে, নূরী ঠিক তার বিপরীত। শত দুশ্চিন্তা মনে দানা বেঁধে থাকলেও সে চুপচাপ থাকতে পারতো না। মোহসিনা বেগম যে কাজ করতে যেতেন, নূরী তার হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে করতো। অবশ্য সব কাজ সে পারতো না, কারণ সে তো কোনোদিন সংসার করেনি, তবে যেটুকু শিখেছিলো তা মনিরাদের ওখানে। সেখানে সব কাজ তাকে করতেও হতো না, নানারকম চাকর-বাকর ছিলো তারাই সব করতো, নূরী থাকতো নূরকে নিয়ে। নূরের সঙ্গে খেলাধুলো করে কেটে যেতো সময়গুলো তার।

একদিন মোহসিনা বেগম পুত্রের জন্য চা-নাস্তা নিয়ে ঘরে যাচ্ছিলেন, নূরী মাঝপথে ধরে ফেলে—আম্মা, আমাকে দিন, আমি সাহেবের ঘরে পৌছে দিচ্ছি।

মোহসিনা বেগম খুশি হয়ে বললেন—যাও নিয়ে যাও মা, দিয়ে এসো।

রওশান রিজভী ভোরের মিষ্টি রোদে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দৈনিক পত্রিকাখানা পড়ছিলেন। পাশের জানালাটি দিয়ে সূর্যের রশ্মি এসে পড়ছিলো তার দেহের উপর।

নূরী খাবারের ট্রে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করতেই হঠাৎ মেঝের কার্পেটে পা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে খাবারের ট্রেটা ছিটকে পড়ে কাঁচের জিনিসগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

রওশান রিজভী চমকে ফিরে তাকান, নূরীকে পড়ে যেতে দেখে দ্রুত পেপারটাকে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে আসেন নূরীর পাশে, তাড়াতাড়ি তুলে দাঁড় করিয়ে দেন তাকে—আহা চোট লেগেছে বুঝি?

নূরীর হাতখানা রওশান রিজভীর হাতের মধ্যে।

নূরীর হাত কেটে গিয়েছে কাঁচের ভাঙা টুকরো লেগে, রক্তে রাঙা হয়ে গেছে রওশান রিজভীর হাতখানাও।

ততক্ষণে ছুটে আসেন মোহসিনা বেগম, নূরীর রক্তমাখা হাতখানার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন —কি সর্বনাশ—কেটে গেছে।

রওশান রিজভী নূরীর হাতখানার ক্ষতস্থান চেপে ধরে শীঘ্র ঔষধ আনার জন্য নির্দেশ দিলেন।

একটা বয় ঔষধ নিয়ে এলে রওশান রিজভী নিজ হস্তে নূরীর হাতে পট্টি বেঁধে দিলেন।

কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো নূরীর মন—তাকে কোনোরকম ভৎর্সনা না করে বরং এতো আদর-যত্ন তাকে আরও অভিভূত করে ফেললো। কিন্তু সেদিনের পর থেকে রওশান রিজভীর মনে নূরী অন্য এক রূপ নিয়ে আভির্ভূত হলো। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন, সত্যি নূরী অপূর্ব এক তরুণী। এমন রূপসী মেয়ে তিনি এর পূর্বে আর দেখেছেন কিনা সন্দেহ।

নূরী যখন মায়ের সঙ্গে বসে গল্প করতো তখন রওশান রিজভী অনতিদুরে এসে বসতেন, যোগ দিতেন তাদের গল্পের সঙ্গে। কখনও বা নূরীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হতেন, নূরী সরল মনে যেতো তার সঙ্গে। কোনো কোনোদিন লেকের ধারে এসে বসতেন রওশান রিজভী আর নূরী। নূরী এসব কোনোদিন দেখেনি—তন্ময় হয়ে দেখতো। লেকে নৌকাযোগে কোনো কোনো তরুণ-তরুণী বিচরণ করে ফিরছে, কোথাও বা পানির ধারে বসে হাত দিয়ে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে তরুণের দেহে। কোথাও বা বয়স্ক ভদ্রলোক তার গিন্নীর সঙ্গে বসে গল্প করছেন—অদূরে খেলা করছে তাঁদের বাচ্চা-কাচ্চার দল।

নূরী এসব দেখতো আর ভাবতো নূরের কথা, ভাবতো মনিরা আর মরিয়ম বেগমের কথা। মনে পড়তো ফুলমিয়ার কথা, আসবার সময় তাকে একটি বার বলে আসার সুযোগটাও সে পায়নি।

রওশান রিজভী জিজ্ঞাসা করতেন—কি ভাবছো নুরী?

নূরী জবাব দিতো—কিছু না। চলুন বাসায় যাই বাবুজি?

উঠে পড়তেন রওশান রিজভী, বলতেন —চলো।

ড্রাইভ্ আসনের পাশেই বসতো নূরী।

রওশান রিজভী ড্রাইভ করতেন আপন মনে। নূরী সম্বন্ধে তাঁর মনে ভাবের উদ্বেগ হলেও তিনি কোনো সময় মুখে কিছু প্রকাশ করতেন না। হাজার হলেও তিনি শিক্ষিত জ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তি, নিজেকে সংযত করে রাখতেন।

বিশেষ করে নূরীর সরলতায় রওশান রিজভী কোনো মতেই হস্তক্ষেপ করতে চান না।

একদিন রওশান রিজভী অফিস থেকে ফিরলে নূরী তার শরীর থেকে জামা খুলে নিচ্ছিলো—এ কাজ নূরী নিজেই গ্রহণ করেছিলো তার মায়ের কাছ খেকে।

রওশান রিজভী যখন অফিস থেকে কর্মক্লান্ত ঘর্মাক্ত দেহ নিয়ে ফিরে আসতেন তখন জননী মোহসিনা বেগম নিজ হস্তে সন্তানের দেহের জামা কাপড় খুলে নিতে সহায়তা করতেন। এমনকি একমাত্র সন্তান রওশানের চুলটাও তিনি নিজে আঁচড়ে দিতেন।

অবশ্য মায়ের এ সবে আপত্তি করতেন রওশান রিজভী। কিন্তু মা মোহসিনা ছিলেন অত্যন্ত জেদী মেয়ে—সন্তানকে তিনি কিছুতেই এসব থেকে রেহাই দিতেন না। আসল কথা পুত্রকে তিনি অত্যন্ত বেশি স্নেহ করতেন।

বৃদ্ধা জননীর পরিশ্রম কমানোর জন্যই নূরী বেছে নিয়েছিলো তাঁর কাজগুলো, তাই সে নিজ হস্তে রওশান রিজভীর সেবা-যত্ন করতো। তাছাড়াও নূরী জানে, এ লোকটার জন্যই আজ তার মুক্তি হয়েছে। না হলে তাকে হয়তো নরহত্যার দায়ে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলতে হতো।

অন্যান্য দিনের মত রওশান রিজভী বাইরে থেকে ফিরে ড্রেস পরিবর্তন করছিলেন।

নূরী এসে দাঁড়ালো, রওশান রিজভীর গা থেকে কোটটা খুলে নিয়ে আলনায় রাখলো, তার জামার বোতামগুলো খুলে দিচ্ছিলো আপন মনে।

রওশান রিজভী বললেন—নূরী, আমার জন্য তুমি যথেষ্ট পরিশ্রম করো—কিন্তু এতো কেন করো বলো তো?

ফিক্ করে হেসে বললো নূরী—আপনি আমার জন্য কত করেছেন আর আমি আপনার জন্য এটুকু পারবো না বাবুজি? আম্মা বুড়ো মানুষ, তিনি খেয়ে একটু ঘুমিয়েছেন---

রওশান রিজভী হেসে বললেন—আর তুমি জেগে আছো আমার জন্য, সত্যি নূরী তোমাকে যত দেখি ততই আমি মুগ্ধ হয়ে যাই।

কেন বাবুজি?

তুমি কি কিছুই বুঝ না?

না। আসুন বাবুজি, চুলটা আঁচড়ে দি। নূরী চিরুণী দিয়ে রওশান রিজভীর চুল আঁচড়ে দেয়।

অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকেন রওশান রিজভী নূরীর সুন্দর মুখমণ্ডলের দিকে।

চুল আঁচড়ে হেসে বললো নূরী—কি দেখছেন অমন করে বাবুজি?

তোমাকে—নূরী, তুমি এতো সুন্দর!

নূরী ফিক করে হেসে বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

❑

রওশান রিজভী দিন দিন বেশি করে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছেন নূরীর দিকে। কর্মব্যস্ততার মধ্যেই তিনি গড়ে উঠেছেন ছোটবেলা হতে। লেখাপড়ায় রওশান রিজভী ছিলেন অত্যন্ত ভাল, তাছাড়াও খেলাধুলায় তিনি ফার্ষ্টবয় ছিলেন। লেখাপড়া আর খেলাধুলো শেষ হতে না হতেই চাকরীর বোঝা এসে পড়েছে তার মাথায়। জীবন তাঁর কর্মমুখর, ফুরসৎ নেই কোনো মুহূর্তে। এসব কারণেই রওশান রিজভী কোনো নারীর সঙ্গে মিশবার সুযোগ পায়নি তেমন করে। নারী সংশ্রব তাকে করেনি তাই আকৃষ্ট। নূরীকে তিনি দেখলেন নতুন এক দৃষ্টি নিয়ে, ভালবেসে ফেললেন তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে ওকে।

রওশান রিজভী জানেন না, নূরীর জীবনে আছে আর একজন—যার জন্য নূরী অহঃরহ প্রতীক্ষা করছে, যার চিন্তায় সে সদাসর্বদা মগ্ন। মনের গোপন বেদনাকে চাপা দিয়ে নূরী সর্বসময় হাসিমুখে কাটায়। জানায় না সে তার প্রিয়জনের পরিচয়—জানাবার উপায়ই বা কোথায়? সে তো আর অন্যান্যর মত স্বাভাবিক জন নয়।

তবু মাঝে মাঝে নূরী আনমনা হয়ে যায়—এই কি তার জীবনের শেষ পরিণতি! কোনোদিনই কি আর দেখা পাবে না তার হুরের? না জানি সে এখন কোথায় কি করছে। নিশ্চয়ই সে এতোদিন জানতে পেরেছে, চৌধুরী

বাড়ি থেকে সে চলে গেছে। হয়তো বা সন্ধান করে ফিরছে, না কি করছে কে জানে।

একদিন শরীর অসুস্থ বোধ করায় রওশান রিজভী নিজের ঘরে শুয়েছিলেন, পাশের ঘরে মা নামায পড়ছেন।

নির্জন দুপুর।

মাথার যন্ত্রণায় উঃ আঃ শব্দ করছিলেন রওশান রিজভী।

নামায শেষে মোহসিনা বেগম বললেন—মা নূরী, যাও না বাছা রওশান যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে, একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে।

নূরী কোনোদিন কারো অবাধ্য হয়নি, আজও সে পারলো না মোহসিনা বেগমের কথা অমান্য করতে। বললো—আচ্ছা যাচ্ছি আম্মা।

নূরী রওশান-জননীকে আম্মা বলে ডাকতো। তিনিও ওকে নিজ কন্যার মতই স্নেহ করতেন।

মোহসিনা বেগমের কথায় নূরী রওশান রিজভীর কক্ষে প্রবেশ করলো। অতি লঘু পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালো রওশান রিজভীর শিয়রে।

রওশান রিজভী তখন চোখ বন্ধ করে নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

নূরী তার কোমল হাতখানা রাখলো রওশান রিজভীর মাথায়।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন রওশান রিজভী—নূরী তুমি?

হাঁ বাবুজি?

আবার চোখ বন্ধ করলেন রওশান রিজভী।

নূরী শিয়রে বসে আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে চললো।

এক সময় বললেন রওশান রিজভী—নূরী, তোমার কষ্ট হচ্ছে?

না তো।

কতক্ষণ হলো বসে আছো।

কিছু হচ্ছে না আমার। আপনি ঘুমান একটু, মাথাটা ছেড়ে যাবে বাবুজি।

নূরী?

বলুন?

নূরী, তোমার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তুমি কিছু বলোনি। তোমার কে আছে জিজ্ঞাসা করায় কোনো জবাব দাওনি। চিরদিন কি তোমার এমনি করে কাটবে? নূরী, আজ তুমি নীরব থেকো না—জবাব দাও, চিরদিন তুমি এমনি পাষাণ প্রতিমার মত নীরবে--

এতোক্ষণে মুখ খুললো নূরী—আমি তো বলেছি এ শহরে আমার কেউ নেই। এ শহরের কাউকে আমি চিনি না বাবুজি।

কোথায় তুমি থাকতে, কোথায় তোমার জন্ম বলো? যদি পারি তোমাকে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করবো।

নূরী পূর্বের ন্যায় স্থির কণ্ঠে বললো—আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন, আপনার কাছে আমি কিছুই লুকাব না।

তবে বলো।

গভীর জঙ্গলে আমার জন্ম, জঙ্গলেই আমি বড় হয়েছি। বাবা-মা এদের দেখিনি, জ্ঞান হবার পূর্বেই হারিয়েছি বাবা মাকে। আমি বড় হতভাগিনী বাবুজি, আমি বড় হত ভাগিনী--

নূরী, আমার মায়ের কাছে তুমি তোমার হারানো মায়ের স্নেহ পাবে।

হাঁ, তার চেয়েও আমি বেশি পেয়েছি। সত্যি, আম্মা আমাকে বড়ই আদর করেন। নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন তিনি আমাকে। বাবুজি, আপনার মায়ের মত মা আর হয় না।

নূরী, চিরদিন কি তুমি আমার মায়ের স্নেহ পেলে সন্তুষ্ট হও না?

সে তো আমার সৌভাগ্য বাবুজি।

তবে কেন তুমি অমন করে আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকো? নূরী---রওশান রিজভী নূরীর হাতখানা দক্ষিণ হস্তের মুঠায় চেপে ধরেন—জবাব দাও নূরী?

নূরী গোপন করে এসেছে তার হুরের কথা, কারণ তার হুর দস্যু আর রওশান রিজভী পুলিশ ইন্সপেক্টর —কোনো ক্রমেই উচিত হবে না তার কথা ব্যক্ত করা। আজও নূরী অতি কষ্টে গোপন করে নেয়, নিজেকে সংযত রেখে বলে—বাবুজি, আমি এক অজ্ঞাত জংলী মেয়ে, আর আপনি ভদ্র সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি?

হলোই বা, তাতে ক্ষতি কি বলো নূরী? তুমি মানুষ, আমি মানুষ—এই তো পরিচয়! নূরী, এসো আমরা দু'জনা দু'জনাকে গ্রহণ করি?

বাবুজি, আমি নাচার।

নূরী, আমাকে বাঁচাও নুরী।

বাবুজি!

রওশান রিজভী নূরীকে ধরতে যান কিন্তু পর মুহূর্তে তিনি নিজেই হাতখানা সরিয়ে নেন—না না, তোমার অমতে আমি তোমাকে স্পর্শ করবো না।

বাবুজি, আপনি ভুল করবেন না বাবুজি।

নূরী, তোমাকে না পেলে আমি মরে যাবো।

সেকি? এ আপনি কি বলছেন?

তোমাকে জোর করে কোনোদিনই গ্রহণ করবো না, কারণ আমি অমানুষ নই। তাছাড়া শক্তি দ্বারা কেউ কোনোদিন ভালবাসা আদায় করতে পারে না। নূরী, তোমার পক্ষ থেকে সাড়া না পেলে আমি চিরদিনই নীরব থাকবো।

বাবুজি আপনি মহৎ জন, এমন কথা আমি কারো মুখে কোনোদিন শুনিনি। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

শ্রদ্ধা করো কিন্তু ভালবাসো না? বলো, বলো নূরী?

অস্ফুট কণ্ঠে বললো নূরী—বাসি।

নূরী, ইস্ কি আনন্দ হচ্ছে আমার! তুমি আমাকে ভালবাসো—স্নেহ করো, যত্ন করো---

হাঁ, ও তোকে খুব ভালবাসেরে রওশান। তোর জন্য ওর কত চিন্তা। কথাগুলো বলতে বলতে ঘরে এসে দাঁড়ালেন মোহসিনা বেগম।

নূরীর হাত ছেড়ে দিয়ে রওশান রিজভী চোখ বন্ধ করলেন।

নূরী তার মাথার চুলে আংগুল চালাতে লাগলো।

মোহসিনা বেগম এসে পুত্রের ললাটে হাত রাখলেন—মাথাটা এখন বেশ ঠাণ্ডাই মনে হচ্ছে। বাবা, তুমি এবার ঘুমাও। মা নূরী, যাও একটু বিশ্রাম করোগে, আমি বসছি।

মোহসিনা বেগম পুত্রের শিয়রে বসলেন, নূরী চলে গেলো নিজের ঘরে।

কিন্তু এরপর থেকে রওশান রিজভী নূরীর জন্য সব সময় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কেমন করে নূরীকে লাভ করবেন—এই তার চিন্তা। রওশান রিজভী ছিলেন সংযমশীল পুরুষ, তাই তিনি কোনো সময় অসংযত কিছু করতেন না।

কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন রওশান রিজভী, পুনরায় তিনি অফিসে যাওয়া-আসা করতে লাগলেন।

একদিন বিকেলে রওশান রিজভী নূরীকে বললেন—চলো বেড়িয়ে আসি।

নূরী কোনো আপত্তি করলো না, বরং সে খুশি হয়ে বললো—চলুন বাবুজি।

রওশান রিজভী স্যুট-প্যান্ট পরে নিলেন।

নূরীও আজ সুন্দর একখানা শাড়ী পরে সজ্জিত হয়ে নিলো। এ শাড়ীখানা তাকে রওশান-জননী ক্রয় করে এনে দিয়েছিলেন। গাঢ় আকাশী রঙ—এর শাড়ী খানা নূরীর গোলাপী দেহটা অপূর্ব মনোমুগ্ধকর করে তুলেছিলো।

চঞ্চল হরিণীর মত কক্ষে প্রবেশ করে নূরী—বাবুজি, দেখুন কেমন লাগছে?

অপূর্ব।

চলুন।

চলো নূরী।

রওশান রিজভী গাড়ির ড্রাইভিং আসনে বসে পড়তেই নূরী উঠে বসলো তার পাশে। গাড়িতে বসলে নূরীর আনন্দ আর ধরতো না, উচ্ছল কণ্ঠে হেসে লুটোপুটি খেতো সে। আজও খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো সে।

সমস্ত বিকেলটা লেকের ধারে, পার্কে ফিরে সন্ধ্যার পূর্বে ফিরে চললেন রওশান রিজভী আর নূরী।

নূরীর মুখে উচ্ছ্বাসিত হাসির আভাস। ফুরফুরে বাতাসে চুলগুলো তার উড়ছে। শাড়ীর আঁচলখানা গাড়ির গবাক্ষ পথে পত্ পত্ করে উড়ছে।

গাড়িখানা তখন পশ্চিম দিকে মুখ করে শিরীন রোড ধরে ছুটছিলো। সূর্যাস্তের সোনালী আলোকরশ্মি গাড়ির সম্মুখস্থ কাঁচের শার্শীর মধ্য দিয়ে এসে পড়ছিলো নূরী আর রওশান রিজভীর মুখের উপর।

নূরীর এবং রওশান রিজভীর মুখ সুর্যাস্তের সোনালী আভায় অপূর্ব লাগছিলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে খেলনার ঝুড়ি নিয়ে সে পথে এগিয়ে আসছিলো ফেরিওয়ালা—চাই খেলনা চাই—মাথার ফিতা, কাটা, আর চুড়ি চাই---

তার পাশ কেটে চলে যায় গাড়িখানা।

চমকে উঠে ফেরিওয়ালাবেশী বনহুর, মুহূর্তের জন্য হলেও নূরীকে চিনতে তার ভুল হয় না। থ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকে সে পথের পাশে। গাড়িখানা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বনহুরের পা থেকে মাথা অবধি একটা বিদ্যুৎ চমকে যায়, সে স্পষ্ট দেখেছে—একটি যুবকের পাশে তার নূরী উপবিষ্ট। উচ্ছল খুশি—ভরা নূরীর দীপ্ত মুখ—কোথায় সেই ঘাগড়া আর ওড়না একখানা শাড়ীর আঁচল চলে গেলো তার মুখের পাশ ছুঁয়ে।

কিছুক্ষণ নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বনহুর, তারপর সম্বিত ফিরে আসে তার মধ্যে। ভাবে হয়তো বা ভূল দেখেছে সে। কিন্তু সে যে স্পষ্ট দেখেছে, সেই মুখ, সেই চোখ—না না, ভুল তার হয়নি। তবে কি নূরী অন্য কোনো যুবককে ভালবেসে তাকে গ্রহণ করে বসেছে! সন্ধান যখন পেয়েছে তখন আর চিন্তা কি।

আজ সন্ধ্যা বয়ে গেছে, কাজেই নূরীকে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হবে। রাতের অন্ধকারে কিছুতেই সম্ভব হবে না, কোন্ বাড়িতে গাড়িখানা প্রবেশ করেছে কে জানে।

বনহুর ফিরে এলো শহরের আস্তানায়। এখান থেকেই তাকে রোজ শহরে ফেরিওয়ালা বেশে বেরুতে হয়। অবশ্য সে আস্তানার ড্রেসিংরুম থেকেই ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং ফিরেও ড্রেসিংরুমে এসে ড্রেস পরিবর্তন করে।

তার বিশিষ্ট অনুচরগণ ছাড়া আর কেউ জানে না তার এ ছদ্মবেশ ধারণের কথা।

বনহুর যখন তার বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করে তখন সে স্বাভাবিক ড্রেসেই থাকে, দস্যু ড্রেসেও নয়।

আজ বনহুরকে অত্যন্ত বিচলিত মনে হচ্ছিলো।

শয্যা গ্রহণ তার কাছে অসহ্য লাগছিলো আজ। এ ক'দিন রহমানও আছে তার কাজে। সেও এক ভিখারীর বেশে অন্বেষণ করে ফিরছে শহরের পথে ঘাটে নূরীকে। বনহুর আর রহমান ছাড়াও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট অনুচর গোপনে এখানে–সেখানে ছড়িয়ে ছিলো। সবাই খুঁজে ফিরছে নূরীকে।

গোটা রাতটা বনহুরের নানা দুশ্চিন্তায় কাটলো।

পরদিন ঠিক পূর্বের ফেরিওয়ালার বেশে বনহুর পৌঁছে গেলো সেই অঞ্চলে, যে অঞ্চলে সে দেখেছিলো নূরীকে এক যুবকের পাশে গাড়িতে। বনহুর পথ ধরে এগিয়ে চলেছে—চাই খেলনা চাই—চুড়ি, ফিতা আর মাথার কাঁটা চাই-- হুরবালা চাই, হুরবালা---

প্রতিটি বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে বনহুর এভাবে উচ্চকণ্ঠে হাঁকতে লাগলো। হুরবালা, মানে সুন্দর বালা চাই। বনহুর ভাবলো, নিশ্চয়ই নূরী এ নাম শুনলো বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু মিথ্যা তার আশা—বনহুর সারাটা দিন পথে পথে ঘুরেও নূরীর কোনো সন্ধান পেলো না। হতাশ হয়ে পড়লো সে। ক্লান্ত অবশ পা দু'খানা টেনে টেনে পথ চলছিলো। বেলা প্রায় গড়িয়ে এসেছে, এমন সময় তার দৃষ্টি চলে গেলো একটা বাড়ির গাড়ি-বারান্দায়। চমকে উঠলো বনহুর—এক নজর দেখলেও গাড়িখানাকে সে ভালভাবেই চিনে নিয়েছিলো। এ যে সেই গাড়ি, যে গাড়ির মধ্যে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবকের পাশে কাল দেখেছিলো তার নূরীকে।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো গাড়িখানার দিকে, কাঁধে তার খেলনার ঝুড়ি।

গেটের পাহারাদার রুখে উঠলো—ইধার কিয়া দেখ্‌তা তুম্‌?

হাম্‌ এইছা একঠো গাড়ি লেঙ্গে, সম্‌ঝা?

কিয়া তুম গাড়ি লেঙ্গে। ফেরিওয়ালা হোকে এতনা বড়াবাৎ বলনেকে শরম নেহি আতা?

নেহি ভাই, হাম্‌ তো বহুৎ পয়সা কামাতা হর রোজ---

পয়সার কথা শুনে অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে পাহারাদার। দু'পা সরে আসে—এধার আও।

ভাই, থোরা পানি পিলাও গে?

পানি পিও গে, তব হিঁয়া বৈঠো। দারোয়ান পয়সার নাম শুনেছে, তাই খুশিতে ডগমগ, নিজেই ছুটলো পানি আনতে।

একটু পরে এক ঘটি পানি নিয়ে ফিরে এলো দারোয়ান।

বনহুর তখন গেটের পাশে সানবাঁধা জায়গাটায় খেলনার ঝুড়ি রেখে বসে পড়েছে। মিথ্যা নয়, পানির পিপাসা তার খুব পেয়েছিলো। ঘটি নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা পানি সে গলধঃকরণ করলো। তারপর বললো —এ কিসকা ঘর?

অবাক হয়ে বললো দারোয়ান —তুম্ লোক এ ঘর নেহি সাম্ঝা?

নেহি ভাই, মাইতো এ শহর মে আভি ক'রোজ আয়া। কই কা ঘর নেহি সামাঝতা।

এ ঘর পুলিশ ইন্সপেক্টর রওশান রিজভী সাহেবকা।

ও আভি হাম সাম্ঝা। আচ্ছা ভাই, তোম্রা মেম সাহেব হ্যায় না? বললো নহুর।

দারোয়ান বললো—নেহি ভাই, মেরা সাহেব তো শাদি নেহি কিয়া।

শাদি নেহি কিয়া? তব এক মেম সাহাব কো সাথ তোমহারা সাহাব কো গাড়ি মে দেখা, ও কোন্?

হাসলো এবার দারোয়ান—ও তো সাহাব কো বিবি নেহি, ভিন্ লাড়কী হ্যায়।

ভিন্ লাড়কী তব হিঁয়া রাহ্তা কাহে?

এত্না খবর তো হাম্ সামাঝতা নেহি।

বনহুর বুঝলো এর বেশি কিছু আর দারোয়ানের কাছে জানা যাবে না, এবার অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। বনহুর এবার খেলনার ঝুড়ি খুলে ফেললো—ভাই তোম্রা সাহাব কো বোলো বহুৎ আচ্ছা চুড়ি, ফিতা আর হুর বালা হ্যায়।

সাহাব তো লাড়কী আদমী নেহি.....

আরে ভাই সাহাব তো নেহি পহেনেগা, ওতো ওহি আদমী কি লিয়ে, যো মেম সাহাব উছকি পাছ রাহে.....

হাঁ আভি হ্যাম্ পুছ্কে আতা।

যাও ভাই।

দারোয়ান চলে গেলো, একটু পরেই ফিরে এলো, খুশি-ভরা তার মুখ, বললো—আপ ভাই অন্দরে মে যাও।

বনহুর তাড়াতাড়ি ঝুড়ি গুটিয়ে দারোয়ানকে অনুসরণ করলো।

সম্মুখের বাগান পেরিয়ে গাড়ি-বারান্দা, তারপরই অন্দর বাড়ির গেট।

দারোয়ান গেটের পাশে এসে বললো—হিঁয়া বইঠো।

বনহুর ঝুড়ি খুলে বসলো, একবার দাড়ি-গোফে হাত বুলিয়ে দেখে নিলো।

এক বৃদ্ধার সঙ্গে বেরিয়ে এলো নূরী।

বনহুর আড়নয়নে তাকিয়ে দেখে নিলো নূরীকে। তার চিনতে একটুও ভুল হয়নি। নূরীর মুখে হাসি—ঠিক্ পূর্বের মতই চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার মধ্যে।

বৃদ্ধা মোহসিনা বেগম বললেন—এই ফেরিওয়ালা, তোমার কাছে কি আছে?

বনহুর গলার স্বর একটু পাল্টে নিয়ে বললো—জো চিজ্ আপ্‌লোক মাঙ্গতা ঐ চিজ মেরা পাশ হ্যায় মাইজী।

দেখি কেমন চুড়ি আছে তোমার কাছে? বললো নূরী।

এক জোড়া বালা হ্যায় মেরা পাশ, উছি বালা কি নাম হুরবালা।

হুরবালা! নূরীর চোখ দুটো যেন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললো—কই দেখি?

বনহুর খুঁজে খুঁজে বের করলো একজোড়া বালা। অতি সুন্দর ঝকঝকে পাথর বসানো বালাগাছা।

নূরীর সন্ধানের জন্য এ বালাগাছা বনহুর কারিগরের নিকট হতে তৈরি করে নিয়েছিলো, উদ্দেশ্য ছিলো এ বালার পেছনে।

বালাগাছা হাতে নিয়ে নূরী মুগ্ধ হয়ে গেলো, এতো সুন্দর বালা সে ইতিপূর্বে দেখেনি, খুশি হয়ে বললো—কত দাম এ বালার?

আপ কো পছন্দ্ হুই?

হাঁ, আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

মোহসিনা বেগম বললেন—দাম বলো, এটা আমি ওকে কিনে দেবো।

বনহুর বললো—দাম পিছে লেগি মাই, আপকো লাড়কীকি হাত মে হুই তব তো।

নূরী বালাগাছা নিজের হাতে পরতে চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুতেই পরতে পারছিলো না। মোহসিনা বেগম বললেন—এসো মা, আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

মোহসিনা বেগম চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই হাতে উঠাতে পারলেন না। হতাশ কণ্ঠে বললেন তিনি—সুন্দর বালাটা, কিন্তু তোমার হাতে উঠবে না মা।

নূরীর মুখ বিমর্ষ হলো, ব্যথা-ভরা কণ্ঠে বললো—তাবে ফিরিয়ে নাও।

বনহুর বললো—আপ আইয়ে, মাই পিনানে সাকতা।

পারবে তো? বললেন মোহসিনা বেগম।

নূরী সরল মনে হাতখানা এগিয়ে দিলো ফেরিওয়ালার দিকে।

ফেরিওয়ালা নূরীর হাতখানা হাতের মুঠায় চেপে ধরে বালাটা হাতে তুলতে চেষ্টা করলো, অল্প চেষ্টায় বালাটা পরিয়ে দিলো সে নূরীর হাতে।

নূরীর পাশে তখন পূর্বদিনের সেই যুবক এসে দাঁড়িয়েছে। হেসে বললো—বাঃ চমৎকার বালা তো।

হাঁ, বাবুজি। বললো নূরী।

এবার যুবক তাকালো বনহুরের দিকে—এই ফেরিওয়ালা, ইস্‌কা দাম কেত্‌না?

বাবুজি, আপ্‌ জো খুশি হামকো দে দিজে।

এ তো বহুত খুবসুরাত বালা হ্যায়।

আপ পছন্দ কিয়া হাম উছিছে বহুৎ খোশ্‌ হুই, আপ লে লিজে। জো খুশি দাম দে দিজে বাবু সাব।

নূরীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হলো।

রওশান রিজভী ব্যাগ খুলে বালার জন্য টাকা মিটিয়ে দিলেন। ফেরীওয়ালাবেশী বনহুর ঝুড়ি গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালো—চাই খেলনা চাই—চুড়ি, ফিতা, মাথার কাঁটা চাই.....

বনহুর আস্তানায় ফিরে ফেরিওয়ালার ড্রেস আজ থেকে ত্যাগ করলো। কারণ এ ড্রেস সে পরেছিলো শুধু নূরীকে খুঁজে বের করার জন্য, এখন এ ড্রেসের প্রয়োজন তার শেষ হয়েছে।

❑

স্যার, কোথায় যাবেন? ড্রাইভ আসন থেকে বললো ড্রাইভার।

পিছন আসনে বসেছিলো রওশান রিজভী আর নূরী। ড্রাইভারের কথায় বললেন রওশান রিজভী—সুরমাবাগ মার্কেটে চলো।

আচ্ছা স্যার। ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

গাড়ি ছুটে চললো উল্কা বেগে।

কান্দাই শহরের জনমুখর রাজপথ—গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

ড্রাইভারের দৃষ্টি সম্মুখে থাকলেও কান ছিলো তার পিছনে। রওশান রিজভী এবং নূরীর মধ্যে যে আলোচনা হচ্ছিলো, সব মনোযোগ সহকারে শুনছিলো সে।

রওশান রিজভী বললেন—নূরী, কাল যে বালা তুমি কিনেছো ওটা অতি মূল্যবান।

হাঁ বাবুজি, আমার খুব পছন্দ হয়েছে বালাটা।

লোকটা সত্যি ভাল, কোনো দামদর করলো না!

নূরী কোনো জবাব দিলো না।
কিছুক্ষণ নীরব, কোনো কথা নেই পিছন আসনে।
পুনরায় শোনা গেলো রওশান রিজভীর গলা—নূরী।
বলুন বাবুজি?
আজ তুমি কি চাও আমার কাছে? শাড়ী, গহনা, না টাকা?
সবুর করেন, আমি বলছি।
বলো কি চাও?
ড্রাইভারের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো সামনের দিকে থাকলেও জ্বলে উঠলো অগ্নিশিখার মত দপ করে। নূরীর জবাব শোনার জন্য সেও উদগ্রীব রইলো।
নূরীর কণ্ঠ—শাড়ী,গহনা, অর্থ কিছুই চাই না আমি।
তবে কি চাও, কি পেলে খুশি হবে বলো নূরী?
আপনার দয়া, আপনার দয়া পেলে আমি অনেক খুশি হবো, বাবুজি।
ড্রাইভার বাঁকা চোখে একবার পিছনে লক্ষ্য করলো, সমস্ত দেহ যেন জ্বালা করে উঠলো তার। নূরীর কথাগুলো তার কানে যেন গরম সীসা ঢেলে দিলো।
হাসলেন রওশান রিজভী—কিন্তু তুমি তো আমার দয়া কামনা করো না নূরী?
আপনি আমার জন্য যা করেছেন তা যে অনেক দয়া বাবুজি। আপনি আমাকে ফাঁসী থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। আশ্রয়হীনা হয়ে যখন পথে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তখন আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছেন। তারপর বাবুজি, আপনি আমাকে একা পেয়েও কোনোদিন মন্দ কথা বলেননি। আপনি আমার ইজ্জৎ রক্ষা করেছেন বাবুজি.......
নূরী, আমি তোমাকে একদিন বলেছি, তোমার অমতে আমি কোনোদিন তোমাকে স্পর্শ করবো না। আমি শুধু তোমার বলার অপেক্ষায় রয়েছি নূরী। তুমি কি চাও, বোনের ভালবাসা না প্রিয়ার প্রেম?
বাবুজি, আমাকে মাফ করবেন বাবুজি! আমি আপনার ছোট বোন। আমি আপনার ছোট বোন বাবুজি.....
ড্রাইভার এতোক্ষণ ভাবছিলো, গাড়িখানাকে এমনভাবে উল্টে দেবে যাতে দু'টোই একসঙ্গে শেষ হয়ে যায়, নূরীর অস্তিত্ব লুপ্ত করে দেবে রওশান রিজভীর সঙ্গে। কিন্তু একি, এ যে নির্মল পবিত্র সম্বোধন!
নূরীর সংগে রওশান রিজভীর তবে কোনো কুৎসিত সম্বন্ধ গড়ে উঠেনি—ছিঃ ছিঃ কেন সে এই ভুল ধারণা করেছিলো, আর একটু হলেই এদের

জীবন বিনষ্ট করে দিতো সে! ড্রাইভার অন্য কেউ নয়—সে স্বয়ং দস্যু বনহুর।

বনহুর আজ ক'দিন হলো অবিরত ভেবেছে—নূরী আর ঐ ইন্সপেক্টরের জীবনলীলা সাঙ্গ করে দেবে, তবেই শান্তি পাবে সে, নইলে অহঃরহ দগ্ধীভূত হবে। বনহুর আজ সে উদ্দেশ্য নিয়েই গাড়ি চালাচ্ছিলো—গাড়িখানা যখন ব্রীজের উপর দিয়ে চলতে থাকবে তখন বনহুর লাফিয়ে পড়বে নিচে আর গাড়িখানা ব্রীজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে যাবে গভীর পানির মধ্যে। সব শেষ হয়ে যাবে, মুছে যাবে নূরীর চিহ্ন......

বনহুরের মন সচ্ছ হয়ে এলো, আর একটু হলেই সে সর্বনাশ করে ফেলেছিলো। নূরী আর রওশান রিজভীকে নিঃশেষ করে ফেলতো, তারপর সে হতো আশ্বস্ত কিন্তু যে ভুল সে আজ করতো কোনোদিনই তা আর সংশোধন হতো না। বনহুরের মনে নূরীর সম্বন্ধে যে সন্দেহের বীজ রোপণ হয়েছিলো তা কোনোদিনই মুছে যেতো না। বনহুর তৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো—নূরী তাহলে অসতী নয়।

মার্কেটিং শেষ করে বাসায় ফিরে এলেন রওশান রিজভী নূরীসহ, অনেক শাড়ী-জামা-জুতো যা প্রয়োজন কিনে দিয়েছেন তিনি নূরীকে। ড্রাইভার অবশ্য তাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলো।

রওশান রিজভী যখন জিনিসগুলো কিনছিলেন তখন নূরীকে তিনি পছন্দ করতে অনুরোধ করছিলেন বার বার এবং বোন বলে সম্বোধন করছিলেন।

ড্রাইভারবেশী বনহুর পিছনে থেকে সব লক্ষ্য করছিলো। নূরীকে রওশান রিজভী যে আশ্রয় দিয়ে অত্যন্ত ভাল কাজ করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। না হলে সে কোথায় যেতো কে জানে। মনে মনে বনহুর রওশান রিজভীকে ধন্যবাদ জানায়।

রওশান রিজভী জিনিসপত্রগুলো ড্রাইভারের হাতে দেন—গাড়িতে নিয়ে চলো।

এগোয় নূরী আর রওশান রিজভী, পিছনে এগিয়ে আসে ড্রাইভারবেশী বনহুর, হাতে তার ক্রয়-করা জিনিসপত্রগুলো। ড্রাইভার জিনিসগুলো গাড়ির ভিতরে রেখে পিছন আসনের দরজা খুলে ধরে।

উঠে বসে নূরী, তারপর উঠেন রওশান রিজভী।

ড্রাইভ্ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দেয় ড্রাইভার।

এ ঘটনার পরও ড্রাইভার বেশে বনহুর রয়ে গেছে পুলিশ ইন্সপেক্টর রওশান রিজভীর বাড়িতে। অনেক চেষ্টা করে তবে সে এখানে ড্রাইভারের কাজ পেয়েছিলো, উদ্দেশ্য নূরীর চরিত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া। সত্যিই যদি

নূরী দুষ্টচরিত্রা হয়ে থাকে তাহলে ওকে খতম করে দেবে সে, আর যদি নূরী পূর্বের মত সচ্ছ-পবিত্র থাকে তবে তাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করবে।

বনহুর নূরীকে পরীক্ষা করে চলেছে—শুধু একদিন নয়, কয়েকদিন ধরে। রওশান রিজভীর আচরণে বনহুর মুগ্ধ হয়েছে। তরুণ অবিবাহিত পুলিশ ইন্সপেক্টর অথচ সে এতো সৎ চরিত্র। বনহুর যদি তার মধ্যে কোনোরকম কলুষিত ভাব দেখতো তাহলে এতোদিন তার জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিতো।

কিন্তু অদ্ভুত মহৎ ব্যক্তি এই রওশান রিজভী—নূরীকে সে অনেক সময় ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েও কোনোরকম অসংযত উক্তি উচ্চারণ করে না বা তার প্রতি কোনো খারাপ আচরণ করে না। বনহুর যেখানেই থাক সব সময় খেয়াল করতো এ ব্যাপারে।

একদিন নূরী বাগানে বসে ফুল দিয়ে মালা গাঁথছিলো, নির্জন বিকেল, রওশান রিজভী গেছেন কাজে। মা মোহসিনা বেগম ঘরে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন। নূরীর পূর্বের অভ্যাস এখন—তেমনি রয়েছে। ফুল সে অত্যন্ত ভালবাসে, সময় পেলেই নূরী ফুল নিয়ে খেলা করতো—আজও অবসর মুহূর্তে সে ফুল দিয়ে মালা গাঁথছিলো।

রওশান রিজভী আজ নিজেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। এটা তার সখ, ড্রাইভার থাকাকালেও তিনি নিজ হস্তে গাড়ি চালিয়ে আনন্দ পান।

রওশান রিজভী বাইরে গেছেন, ড্রাইভার তাই বাসাতেই আছে। নিস্তব্ধ দুপুরটা পাহারাদারের সঙ্গে গল্প করে কেটেছে তার, এখন পাহারাদার কোনো কাজে কোথায় যেন গেছে।

ড্রাইভার বসে ছিলো, হঠাৎ তার নজর চলে যায় বাগানে—ঐ তো নূরী একটা হাস্না হেনার ঝোপের আড়ালে বসে ফুলের মালা গাঁথছে। একটু হাসি ফুটে উঠে ড্রাইভারের ঠোঁটে, উঠে দাঁড়ায় সে।

লঘু পদক্ষেপে নূরীর পিছনে এসে দাঁড়ায়, আস্তে চোখ দুটো ধরে ফেলে ওর।

চমকে উঠে নূরী, বিদ্যুৎ গতিতে হাত দু'খানা সরিয়ে দিতে দিতে বলে—ছিঃ বাবুজি এই আপনার কাজ.....কিন্তু ফিরে তাকাতেই আড়ষ্ট হয়ে যায় কিছুক্ষণ কোনো কথা বের হয় না নূরীর মুখ থেকে। প্রথমে ভেবেছিলো, তার চোখ দুটি বোধ হয় রওশান রিজভীই ধরেছেন তাই সে বলেছিলো, ছিঃ বাবুজি এই আপনার কাজ। কিন্তু যখনই নূরী বাবুজির স্থানে ড্রাইভারকে দেখলো তখনই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো, ড্রাইভার এতো সাহস পেলো কি করে!

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো নূরী, তারপর রাগতকণ্ঠে বললো—ড্রাইভার, তোমার এত স্পর্ধা? আজই তোমার চাকরী খতম মনে রেখো।

ড্রাইভার নূরীর উচ্চকণ্ঠে ভড়কে গেলো, এই বুঝি এসে পড়েন ইন্সপেক্টার জননী, তাহলেই সব প্ল্যান নষ্ট হয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি মুখের নকল ফ্রেঞ্চ কাটা দাড়ি খুলে ফেললো, সঙ্গে সঙ্গে গোঁফ জোড়াও খুলে নিলো সে হাতের মধ্যে।

নূরী তাকাতেই অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—হুর! সঙ্গে সঙ্গে নূরী ঝাপিয়ে পড়লো ড্রাইভারবেশী বনহুরের বুকে।

বনহুর নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলো, চিবুকখানা তুলে ধরলো নিজের মুখের কাছে।

ঠিক সে মুহূর্তে অদূরে এসে দাঁড়ালেন রওশান রিজভী। একি, এ যে অপরিচিত এক যুবকের সঙ্গে নূরী! কঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠলেন—নূরী!

বনহুর নূরীকে মুক্ত করে দেয়।

নূরী লজ্জিতভাবে সরে দাঁড়ায়।

কখন যে রওশান রিজভী এসে পড়েছেন তারা জানতেই পারেনি। হঠাৎ তার কণ্ঠস্বরে উভয়ে চমকে উঠে।

নূরী লজ্জা-ভরা দৃষ্টি তুলে ধরে—বাবুজি!

ততক্ষণে রওশান রিজভী বনহুরের জামার কলার মুঠায় চেপে ধরে ভীষণ জোরে ঝাকুনি দেন—কে তুমি?

বনহুর কোনো জবাব দেবার পূর্বেই রওশান রিজভী প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিতে যান তার নাকের উপর কিন্তু বনহুর বাম হস্তে খপ্ করে ধরে ফেলে রওশান রিজভীর দক্ষিণ হাতখানা।

অবাক হন রওশান রিজভী—কে এই যুবক যে তার হাতখানা এমন সহজে ধরে ফেললো। অদ্ভুত শক্তি লোকটার দেহে, এক চুল হাত নড়াতে পারলেন না রওশান রিজভী।

বনহুর হাসলো, ছেড়ে দিলো রওশান রিজভীর হাতখানা।

নূরী বললো—বাবুজি, এ আমার স্বামী।

বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে বললেন রওশান রিজভী—তোমার স্বামী! তুমি বিবাহিতা নূরী?

হাঁ বাবুজি! লজ্জায় মাথাটা নীচু করে নিলো নূরী।

রওশান রিজভী বললেন—এতোদিন বলোনি কেন যে তোমার কেউ আছে? আমি তাহলে তার সন্ধান করতাম।

আমি ভুল করেছি বাবুজি। আমাকে মাফ করবেন।

বনহুর হেসে বললো—স্যার, আপনি ওকে রক্ষা করেছেন সেজন্য অনেক অনেক শুকরিয়া।

রওশান রিজভী তাকালেন বনহুরের মুখের দিকে, তার পৌরুষদীপ্ত সুন্দর চেহারা আর গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠস্বরে অভিভূত হলেন তিনি। কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না তিনি, অবাক হয়ে ভাবছেন—কে এই যুবক?

বনহুর বললো—স্যার, নূরীকে আমি এবার নিয়ে যেতে চাই।

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে নিলেন রওশান রিজভী। তারপর বললেন—নূরীর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, কাজেই সে যা চায় তাই করবে।

নূরী বললো—বাবুজি, আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আপনি জীবনদাতা, চিরদিন আপনার কথা মনে থাকবে।

মাকে বলে যাবে না নূরী? বললেন রওশান রিজভী।

আম্মাকে না বলে আমি যাবো না বাবুজি।

রওশান রিজভী বনহুরকে লক্ষ্য করে বললেন—এলো আমার বৈঠকখানায়, নূরী আমার মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে আসুক।

মোহসিনা বেগম নূরীর চলে যাওয়ার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন, তিনি ভাবতেও পারেননি নূরীকে কোনোদিন বিদায় দিতে হবে।

অশ্রু বিসর্জন করে বললেন মোহসিনা বেগম—কেন তবে মায়া বাড়াতে এসেছিলে মা? যাও, দোয়া করি চিরদিন সুখে থেকো।

রওশান রিজভীর চোখ দু'টোও ছলছল করছিলো, তিসি বললেন—নূরী, তোমার ভাইকে ভুলে যেও না যেন?

নূরী রওশান রিজভীর পায়ে কদমবুসী করে বললো—ভাইয়া, কোনোদিন ভুলবো না আপনার দয়ার কথা।

বনহুর নূরীকে নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লো।

মোহসিনা বেগম আর রওশান রিজভী তাদের গেট অবধি এগিয়ে দিলেন।

পথের বাঁকে বনহুর বনহুর আর নূরীর ঘোড়ার গাড়িখানা অদৃশ্য হলো; রওশান রিজভী ফিরে তাকালেন মায়ের দিকে—মায়ের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

রওশান রিজভী বললেন—আম্মা চলো। মায়ের অজ্ঞাতে তিনিও রুমালে চোখ মুছলেন।

❑

কান্দাই আস্তানা।

বনহুর নূরীকে নিয়ে ফিরে এলো তাজের পিঠে। আজ নূরীর মনে অফুরন্ত আনন্দ। কতদিন পর সে ফিরে এসেছে আস্তানায়, উচ্ছল ঝরণার মতই চঞ্চল হয়ে উঠেছে সে। আজ সব যেন তার কাছে নতুন মনে হচ্ছে।

তাজের পিঠ থেকে নেমে দ্রুত ছুটে গেলো সে দাইমার কাছে। বৃদ্ধা দাইমা এখনও বেঁচে আছে কিন্তু নড়াচড়া করতো পারে না সে তেমন করে, বসে বসেই সব দেখাশোনা করে। খোঁজখবর রাখে সব দিকে।

নূরী দাইমার গলা জড়িয়ে ধরে আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করলো। ছুটে চললো অন্যান্য সঙ্গীনির কাছে। সবার সঙ্গে দেখা হলো কিন্তু নাসরিন কই—নাসরিনকে না দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হলো। বনহুরের নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করলো—বলো হুর, নাসরিন কই?

সে আছে, আসবে পরে।

কোথায় বলো?

কান্দাই শহরে।

সেখানে কেন?

বনহুর সুভাষিণী সম্বন্ধে নূরীর কাছে সম্পূর্ণ চেপে যায়। আবার হয়তো সে জেদ ধরে বসতো, তাকেও নিয়ে যেতে হবে সেখানে। তাই বললো বনহুর—রহমানের সঙ্গে নাসরিনের বিয়ে হয়েছে, তাই রহমান তাকে সখ করে সেখানে নিয়ে গেছে। তাদের বিরক্ত করা ঠিক নয়।

রহমানের সঙ্গে নাসরিনের বিয়ে হওয়ার কথা শুনে খুশি হলো নূরী, আনন্দে আপ্লুত হলো সে। বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে বললো—রহমানকে নিজের করে পেয়ে নাসরিন বুঝি খুব খুশি হয়েছে হুর?

নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করলেই পারো।

নূরী বনহুরের নাকটা ধরে একটু টেনে দিয়ে ফিক্ করে হাসে।

বনহুর ওকে ধরতে যায় খপ্ করে, কিন্তু পারে না—ছুটে বেরিয়ে যায় নূরী সেখান থেকে। বনহুর ওকে অনুসরণ করে, নূরী আড়ালে লুকিয়ে পড়ে—খোঁজে সে।

বনহুর আর নূরীতে মিলে যেন লুকোচুরি চলে।

এক সময় ধরে ফেলে ওকে বনহুর।

নূরী হেসে লুটিয়ে পড়ে।

আবার আস্তানা আনন্দে মুখর হয়ে উঠে।

বনহুর তাজকে ঘাস খাওয়ায়; দক্ষিণ হস্তে তার তাজের লাগাম। বাম হস্তখানা নূরীর হাতের মুঠায়; নূরী এগিয়ে চলেছে আগে আগে, পিছনে বনহুর। তাজ ঘাস খেতে খেতে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে।

ঝরণার পাশে এসে বসে পড়ে বনহুর।

তাজ ছাড়া পেয়ে অদূরে ঘাস খেতে শুরু করে।

নূরী শুয়ে পড়ে বনহুরের কোলে মাথা রেখে সবুজ দুর্বা ঘাসের উপর। কতদিন এমন করে বনহুরের কোলো মাথা রেখে শোয়নি নূরী। কতদিন গান শোনায়নি সে তাকে।

বললো নূরী—হুর, গান শুনবে না?

যদি ইচ্ছে করো একটা গান শোনাও নূরী।

নূরী বনহুরের হাতখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। বলে সে—কোন্ গানটা শুনবে বলো?

যে গান তোমার ভালো লাগে।

নূরী গান গায়।

তন্ময় হয়ে যায় বনহুর। ঝরণার কুলকুল জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে নূরীর কণ্ঠের সুর মিলে অপূর্ব শোনায়!

আকাশে চাঁদ ভেসে উঠে, জোছনার আলোতে উচ্ছল হয়ে উঠে বনভূমি। ঝরণার জলে রূপালী রঙ-এর ঢেউ জাগে।

নূরীর গান একসময় শেষ হয়।

বনহুর নূরীর কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বললো—নূরী, আমাকে পুনরায় বাংলা অঞ্চলে যেতে হবে।

চমকে উঠলো নূরী, বাংলাদেশের মাটিতে সেও গিয়ে পড়েছিলো। কত না নাকানি-চুবানি তাকে খেতে হয়েছে। কতই না বিপদ এসেছে তার মাথার উপরে। বাংলায় বনহুরের জীবনেও এসেছে নানা দুর্যোগের ঘনঘটা। বার বার মৃত্যুর কবল থেকে কোনো রকমে বেঁচে গেছে—আবার সেই বাংলাদেশ! নূরীর মুখমণ্ডল মুহূর্তে বিষন্ন হলো, বললো সে—না, কিছুতেই তোমাকে বাংলাদেশে যেতে দেবো না, যেতে দেবো না হুর।

জরুরী প্রয়োজনে আমাকে যেতে হবে নূরী।

সব কাজই তো তোমার জরুরী। যত কাজই থাক এবার তোমাকে ছাড়ছি না আমি।

নূরী, আমাকে বাধা দিও না।

নূরী ওড়না দিয়ে বনহুরের গলা বেষ্ঠন করে বললো—ছাড়লে তো তুমি যাবে? আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়বো না।

হেসে বলে বনহুর—পাগলী মেয়ে!

আর তুমি আস্ত পাগল।

চলো আস্তানায় ফেরা যাক্।

আর একটু বসো না, কতদিন ঝরণার ধারে আসিনি। দেখছো না তাজ কেমন নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাচ্ছে।

নূরী, আমি বুঝতে পারি না কেন তোমরা এতো স্বার্থপর হও?

তার মানে?

মানে তোমরা সব সময় নিজের ভালটা চাও, কিসে পরের মঙ্গল হবে বা উপকার হবে, একথা তোমরা ভাব না। বাংলাদেশে যাওয়ার পিছনে আমার উদ্দেশ্য আছে নূরী।

সেদিন আর বেশি কথা হয় না; বনহুর উঠে পড়ে, তাজকে উদ্দেশ্য করে শিস দেয় সে। সঙ্গে সঙ্গে তাজ এগিয়ে আসে, নূরীকে বনহুর সহায়তা করে ঘোড়ায় চড়ে বসতে, তারপর বনহুর নিজেও চেপে বসে। বাম হস্তে নূরীকে আঁকড়ে ধরে দক্ষিণ হস্তে তাজের লাগাম টেনে ধরে।

তাজ ছুটতে শুরু করে।

আস্তানা অভিমুখে চললো তারা। বনহুর আর নূরী যেন কোনো রাজপুরীর রাজপুত্র আর রাজকন্যা, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যেন ওরা চলেছে অজানার দেশে।

❑

নূরী বনহুরকে ভুলিয়ে রাখার নানারকম চেষ্টা করে। যেন সে আর তাকে ত্যাগ করে কোথাও চলে না যায়।

কিন্তু নূরী ব্যর্থ হয়।

বনহুর যা করে বা করবে কেউ তাকে রুখতে পারবে না। নূরীও পারে না তাকে ধরে রাখতে। একদিন রহমান এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত অনুচরের কাছে বিদায় নিয়ে বনহুর রওয়ানা দেয় সুভাষিণীকে নিয়ে মাধবপুর অভিমুখে।

কান্দাই এরোড্রামে প্লেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে বনহুর আর সুভাষিণী। বনহুরের দেহে স্যুট, চোখে গগলস্।

এ মুহূর্তে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না—এই সুদর্শন যুবক একজন প্রখ্যাত দস্যু।

সুভাষিণীর সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছিলো বনহুর।

আজ সুভাষিণীর মনে অফুরন্ত আনন্দ—ওকে এমন করে পাশে পেয়েছে, এ যেন তার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু একটা ব্যথা তার মনে গুমড়ে কেঁদে ফিরছিলো, সমাজ তাকে আশ্রয় দেবে কিনা!

প্লেন এসে পৌঁছতেই বনহুর আর সুভাষিণী অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে নিজ নিজ আসনে উঠে বসলো।

এমন সময় একটি শিখ তরুণ যুবক হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে প্লেনে উঠে বসলো। ঠিক বনহুর আর সুভাষিণীর পিছন আসনে বসলো শিখ তরুণটি। বয়স বিশ-বাইশ হবে, সরু গোঁফের কৃষ্ণরেখা সবেমাত্র ফুটে উঠেছে ওষ্ঠদ্বয়ের উপরে। গায়ে ঢিলা কুচিওয়ালা পা-জামা আর জামা। মাথায় পাগড়ী, পায়ে নাগড়া, দক্ষিণহস্তে লোহার সরুবালা। শিখ তরুণটির হাতে একটি সুটকেস।

শিখ তরুণ প্লেনে উঠে বসে। প্লেনের মধ্যে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে লাগলো। মনে হলো, পরিচিত কাউকে সে অন্বেষণ করছে।

প্লেন আকাশে উড়ে চললো।

দু'পাশে সাদা সাদা মেঘগুলো ছুটে যাচ্ছে পেঁজা তুলার মত।

সিটের সঙ্গে বেল্টগুলো বাঁধা হয়েছিলো প্লেন উঠবার সময়, এখন সবাই নিজ নিজ কোমর থেকে বেল্ট খুলে ভাল হয়ে বসলো। এয়ার হোস্ট্রেস্ ট্রের উপরে চক্লেট আর গরম কফি নিয়ে হাজির হলো।

প্রত্যেক যাত্রীর সম্মুখে এগিয়ে ধরছিলো কফি আর চকলেটগুলো।

শিখ তরুণ চকলেট আর কফির কাপ হাতে তুলে নিলো। গরম কফির কাপে চুমুক দিতেই কাপটা তার হাত থেকে পড়ে গেলো প্লেনের মেঝেয়।

তরুণ বিব্রতভাবে তাকাতে লাগলো, তার মুখ দেখে মনে হলো সে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছে। কফি খাওয়া বোধ হয় তার অভ্যাস ছিলো না, হঠাৎ গরম কফি মুখে দেওয়ায় জিভ পুড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে খসে পড়ে কাপটা মেঝেতে।

সবাই শব্দ শুনে তাকালো সে দিকে।

শিখ তরুণ জড়োসড়ো হয়ে সঙ্কোচিতভাবে বসে রইলো।

সুভাষিণী যুবকটির বিব্রতভাব লক্ষ্য করে হাসছিলো মুখে রুমাল চাপা দিয়ে।

বনহুর কিন্তু গম্ভীর হয়ে বসেছিলো, একবার মাত্র তাকিয়ে দেখে নিয়েছিলো সে শিখ তরুণটিকে। বনহুরের মনে তখন নানা চিন্তার জাল ছড়িয়ে পড়েছে। আজে সে যে-দেশে চলেছে একদিন সে দেশের আশেপাশেই ছিলো তার আস্তানা, তার অগণিত অনুচরও ছিলো সেখানে। এ আস্তানায় থাকাকালেই বনহুরে সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিলো সুভাষিণীর। মাধবপুরের জমিদার ব্রজবিহারী রায়ের কন্যা সুভাষিণী। যদিও কান্দাই আস্তানা থেকে অশ্বযোগেও মাধবপুর আসাটা তার অসম্ভব নয় তবু বনহুর সময় অল্প করে নেওয়ার জন্যই আজ প্লেনে উঠে বসেছে।

❑

ভগবৎগঞ্জ এরোড্রামে প্লেন পৌঁছে গেলো। মাঝখানে আরও একটি এরোড্রামে তাদের প্লেন অবতরণ করেছিলো। ভগবৎগঞ্জ বাংলার প্রায় কাছাকাছি—পুরোন এ শহর।

বনহুর আর সুভাষিণী নেমে পড়লো ভগবৎগঞ্জ এরোড্রামে।

বনহুর লক্ষ্য করেছে, শিখ তরুণটি আগের এরোড্রামে নেমে গেছে। ওর চালচলন বনহুরের কাছে বেশ সন্দেহজনক মনে হয়েছিলো, ভেবেছিলো সে কেউ তাকে ফলো করছে কিনা কিন্তু তরুণটা যখন আগের এরোড্রামে নেমে গেলো তখন আর সন্দেহের কিছু রইলো না।

ভগবৎগঞ্জে নেমে বনহুর ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলো, সঙ্গে তার সুভাষিণী। একটা হোটেলে এসে উঠলো তারা। ভগবৎগঞ্জের অদূরে গঙ্গা নদী, কাজেই এ হোটেলে অসম্ভব ভিড়। গঙ্গাস্নান উপলক্ষে যাত্রিগণ নারী-পুরুষ অনেকেই এ হোটেলে আশ্রয় নি য়েছেন।

দু'খানা ঘর ভাড়া নেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও বনহুর বাধ্য হলো একখানা কামরা ভাড়া নিতে, কারণ এই একটি কামরাই খালি ছিলো।

অন্যান্য হোটেলে আরও ভিড়, বছরের পূর্ণিমাস এটা, কাজেই কোনো হোটেলে তিল ঠাঁই নেই। হিন্দু স্নানযাত্রীদের ভিড়ে সমস্ত শহর গস্‌গস্‌ করছে। পথেঘাটে চলা মুস্কিল। কাশীতীর্থ স্থানের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় গভবৎগঞ্জ গঙ্গা স্থান।

বনহুর সুভাষিণীকে হোটেলে রেখে শহরে চলে গেলো প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য।

ফিরে এলো একগাদা জিনিসপত্র নিয়ে।

সুভাষিণীকে বললো—সুভা, নাও এর মধ্যে তোমার দরকারী জিনিসপত্র সব পাবে, গুছিয়ে নাও।

বনহুর সুভাষিনীর কাছে সব বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেলো বাইরে। গাড়িতে উঠে বসলো বনহুর, উদ্দেশ্য শহরটা একবার পরিদর্শন করে ফিরে আসবে।

গাড়িতে উঠে বসতেই একটি বয় এগিয়ে এলো, যে একটু পূর্বে তার মালপত্রগুলো বয়ে এনেছিলো হোটেলে। বললো—বাবু আমার পয়সা?

ওঃ মস্ত ভুল হয়েছে বনহুরের, মনে ছিলো না কুলি বয়টার পয়সা মিটিয়ে দেওয়ার কথা। বনহুর ব্যাগ খুলে কুলির পাওনা মিটিয়ে দিলো।

সালাম দিয়ে চলে গেলো কুলিটা অন্য বাবুর পিছনে।

বনহুর যখন ফিরে এলো তখন সুভাষিণী একটি ঘরের মধ্যেই যেন সংসার গুছিয়ে নিয়েছে। কক্ষমধ্যে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে

দেখলো; সুভাষিণীর পাশে সেই ছোকরা বয়টাকে দেখে বললো—ওকেই বুঝি খুঁজে নিয়েছো?

হাঁ ওকে সঙ্গে করেই সব গোছালাম। কেমন হয়েছে?

চমৎকার! বয়টার দিকে তাকিয়ে বললো বনহুর—কিরে, পয়সা চাই?

বয় মাথা নীচু করে রইলো।

সুভাষিণী বললো—দুটি খাবে তাই.....

বনহুর গা থেকে জামা খুলতে খুলতে বললো—ওঃ বেশ, ওকে আমাদের খাবার থেকে ভালভাবে খাইয়ে দিও।

বনহুর জামাটা খুলতেই এগিয়ে গেলো ছোকরা—দিন, আমি রাখছি।

হেসে বললো বনহুর—সুভা, আমাদের একজন সঙ্গী পাওয়া গেলো।

ছোকরার হাতে জামাটা খুলে দিতেই সে জামাটা সুন্দর করে গুছিয়ে রাখলো।

বনহুর বললো—তোর নাম কিরে?

ছোকরা চট্ করে বললো—হরিনাথ।

বাঃ চমৎকার নাম তোর। আচ্ছা হরি?

বলুন বাবু?

তুই এখানে কাজ করবি? আমি তোকে মাইনে দেবো। আচ্ছা, কত কামাস তুই দিনে?

বাবু, কোনোদিন পাঁচ টাকা হয় কোনোদিন পাঁচ সিকাও পাই না। আপনি যদি রাখেন যা দেন নেবো।

তবু কত পেলে তুই খুশি হবি?

আমি কি বলবো বাবু, আপনার যা দয়া হয় দেবেন।

যদি মাসে এক শো দেই?

বাবু! এতো টাকার কথা শুনে ছোকরার চোখ খুশিতে চকচক করে উঠে।

বেশ, একশো করেই তোকে দেবো?

আচ্ছা, বাবু।

কে আছে তোর?

কেউ নেই। দেশে এক বুড়ো মা ছাড়া।

আচ্ছা, আমরা যতদিন এখানে থাকি তুই আমাদের সঙ্গে থাকবি?

থাকবো।

সুভা, একে তুমি তোমার কাজে চালিয়ে নেবে। ধরো আমি তো সব সময় তোমার কাছে থাকতে পারবো না, তখন ও তোমাকে.......

থাক আর বলতে হবে না, সে আমি ওকে বলে ঠিক করে নেবো।

বনহুর হেসে বাথরুমে চলে গেলো।

হোটেলে অত্যন্ত ভিড়, কাজেই বনহুর ষ্টোভ এবং হাড়ি-পাতিল সব এনে দিয়েছিলো, সুভা হাড়ির সাহায্যে রান্নাবান্না করে নিলো।

বনহুর বাথরুম থেকে আসতেই সুভা বললো—খেয়ে নাও তুমি।

বনহুর কোনো প্রতিবাদ করলো না, খেতে বসলো।

অদূরে হরিকে একটা পাতায় খেতে দিলো, সুভা নিজেও বসলো। খাওয়া শেষ করে গল্প নিয়ে মেতে উঠলো সুভা আর বনহুর, দরজার পাশে বসে রইলো হরি।

সুভা ধরে বসলো বিকেলে বেড়াতে বের হবে তারা।

হরি থাকবে হোটেলে, তাদের রান্নাটা করে রাখবে।

সুভা আর বনহুর বিকেলে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লো, হরি তাদের গাড়ি অবধি এগিয়ে দিলো গরম দুধের ফ্লাস্কটা নিয়ে।

ভাগবৎগঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে শ্যামলীয়া পাহাড়। নীল আকাশের গায়ে পাহাড়টা যেন মিশে রয়েছে। শ্যামলীয়ার রঙও গাঢ় নীল। শ্যামলীয়ার পাদমূল বেয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা নদী।

বনহুরের ইচ্ছা ভগবৎগঞ্জে দু' একদিন কাটিয়ে সুভাকে নিয়ে রওয়ানা দেবে মাধবপুরে, পৌঁছে দেবে তার বাড়িতে। এ শহরটা তার দেখা নিতান্ত প্রয়োজন। অবশ্য বনহুরের উদ্দেশ্য, হঠাৎ যদি এখানে সুভাষিণীর স্বামীর সাক্ষাৎ ঘটে যায় তাহলে তার বাসনা সিদ্ধ হবে, সুভাকে অর্পণ করবে স্বামীহস্তে।

বনহুর ড্রাইভারকে বললো—শ্যামলীয়া পাহাড়ে চলো।

শুনেছিলো বনহুর, এ পাহাড়টা নাকি দেখার মত একটা জিনিস। পাহাড় হলেও এর উপরে অনেক সুন্দর সুন্দর বাগান আছে, বিকেলে অনেক লোকজন এখানে বেড়াতে আসে। গঙ্গা স্নানের সময় তো কথাই নেই। ভগবৎগঞ্জ শহর যখন লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে তখন অনেকে এ পাহাড়ের উপর এসেও আস্তানা গাড়ে। ছোট ছোট তাঁবু ফেলে বাস করে তারা যাযাবরের মত। তারপর তীর্থস্নান শেষ করে ফিরে যায় সে যার দেশ অভিমুখে। কাশীতে যেমন সর্বসময় তীর্থস্নান চলে, ভগবৎগঞ্জে ঠিক তা নয়—এখানে বছরে একবার। দূর্গোৎসবের পর বিসর্জন শেষে এ স্নান শুরু হয়।

গঙ্গায় মাকে বিসর্জন দেবার পর ভক্তগণ মাতৃদেহ ধৌত জলে স্নান করে পুণ্যিলাভে মেতে উঠে। এ সময়ে শহরের অবস্থা অবর্ণনীয়। নারী-পুরুষ কোনো ভেদাভেদ নেই। পথে প্রান্তে শহরে বিভিন্ন বাড়িতে শুধু নারী আর পুরুষ।

বনহুর এখানে পৌঁছবার পূর্বেও জানতো না ভগবৎগঞ্জের অবস্থা এখন এরকম। একমাস চলবে এ স্নান উৎসব।

বনহুর আর সুভাষিণীকে নিয়ে গাড়ি পৌঁছে গেলো গঙ্গাতীরে। গঙ্গায় অসংখ্য নৌকা অপেক্ষা করছে। এসব নৌকাযোগে যাত্রিগণ গঙ্গার ওপারে শ্যামলীয়া পাহাড় দর্শন করে এবং সেখানে যায়।

ড্রাইভার বললো—বাবু, আপনারা ঐ নৌকা একটি ভাড়া করে ওপারে চলে যান।

হাঁ, তুমি এখানে অপেক্ষা করো যতক্ষণ আমরা ফিরে না আসি।

আচ্ছা বাবু। বললো ড্রাইভার।

বনহুর সুভাষিণীকে নিয়ে গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়ালো।

একসঙ্গে চার-পাঁচখানা নৌকা এগিয়ে এলো দাঁড় বেয়ে। সবাই চায় তাদের নৌকায় উঠাতে। এতো লোক পারাপার হচ্ছে তবু মাঝিদের আরও লোভ।

সবাই চেঁচাচ্ছে—বাবু আসুন। বাবু আসুন। বাবু আসুন।

বনহুর একটা নৌকায় উঠে সুভাষিণীর দিকে হাত বাড়ালো—এসো।

সুভাষিণী হাত রাখলো বনহুরের হাতে।

টেনে তুলে নিলো বনহুর সুভাষিণীকে নৌকায়।

তাকালো বনহুর গঙ্গার দিকে, অসংখ্য নর-নারী গঙ্গার জলে স্নান করছে। জল নয় যেন কাদা গোলা জলস্রোত। লজ্জায় বনহুরের মাথা নত হয়ে এলো—পুরুষ নারী সবাই এক সঙ্গে স্নান করছে, লজ্জা-শরম বলতে তাদের আছে বলে মনে হয় না। সব রকম বয়সেরই নারী-পুরুষ একসঙ্গে মিলিত হয়ে স্নান করছে। বৃদ্ধ, বয়স্ক, যুবক-যুবতী—সব রকম বয়সই আছে। স্নানের সময় যুবতী নারীদের দেহে বসন আছে কিনা বোঝা মুশকিল, পুণ্যির নামে যৌবন অঙ্গ অপর পুরুষদের দেখানোই হয়তো এদের উদ্দেশ্য।

বনহুরের সামনে সুভাষিণী লজ্জাবোধ করছিলো।

বনহুর বললো—সুভা, তুমিও কিছু পুণ্যি অর্জন করে নাও? বলো তো ব্যবস্থা করেদি?

সুভাষিণী বললো—হিন্দু হলেও আমি ওসবের পক্ষপাতী নই।

তাহলে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। দেখো দেখি ওরা কি মানুষ না মেষ? কর্দমাক্ত জলে কিভাবে ডুব দিচ্ছে?

ছিঃ আমার ওসব পছন্দ হয় না।

এর নামই তোমাদের হিন্দু ধর্ম, তাই না?

হাঁ। কিন্তু আমার জন্য নয়।

মাঝির কণ্ঠ—বাবু, তীরে এসে গেছে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো এবং নৌকার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সুভাষিণীসহ নেমে পড়লো।

বেশ উঁচু জায়গাটা, যেখানে ওরা নেমে দাঁড়ালো সেখানে একটু সমতল। তীরে এমনি আরও অনেক সমতল জায়গা আছে।

বনহুর সুভাষিণীকে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলো।

শ্যামলীয়া পাহাড় সত্যি শ্যামল বটে। পাথর আর ইটের বালাই নেই। শুধু উঁচুনীচু মাটির টিলা ও সমতলভূমি।

বনহুর আর সুভা এগুচ্ছিলো।

মাঝে মাঝে সমতল ভূমিতে সুন্দর সুন্দর বাগান আর পানির ফোয়ারা। কৌশলে গঙ্গার জলদ্বারা ফোয়ারা তৈরি করা হয়েছে। বনহুর আরও দেখলো, পাহাড়ের স্থানে স্থানে ছোট ছোট দোকান রয়েছে। এসব দোকানে সামান্য খাবার এবং পান-বিড়ি-সিগারেট বিক্রি হচ্ছে।

বনহুর একটা দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিলো।

যতই উপরে উঠছে ততই নিচে আরও সুন্দর লাগছে। গঙ্গাতীরের মানুষগুলোকে ক্ষুদে মানুষ বলে মনে হচ্ছে যেন। আর গঙ্গা জলে অসংখ্য কালো বলের মতই লাগছে স্নান-যাত্রীদের মাথাগুলোকে।

অনেক উঁচুতে উঠে বনহুর আর সুভাষিণী একটা পাথরাসনে উপবেশন করলো।

বনহুর সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে বললো—অদ্ভুত পাহাড় পাথরের নাম গন্ধ নেই, শুধু সবুজের ছড়াছড়ি। কি সুন্দর বাগানগুলো!

বনহুর আর সুভাষিণী যেখানে বসেছিলো সে স্থানের অদূরে কয়েকটা গোলাকার বাগান। বাগানে নানা বর্ণের ফুল ফুটে আছে। বেলাশেষের অস্তগামী সূর্যের আলোতে লাল-হলুদ-গোলাপী ফুলে ফুলে যেন রঙ-এর রামধনু খেলা করছে।

বনহুর ফুলের গাছগুলোর দিকে নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে ছিলো। ফুরফুরে বাতাসে তার পাতলা চুলগুলো উড়ছিলো। গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলো সে।

বনহুরের একখানা হাত পাথরাসনের উপরে ছিলো।

অন্য একটি হাতের স্পর্শে চমকে উঠলো বনহুর। আলগোছে তাকালো বনহুর নিজের হাতখানার দিকে। দেখতে পেলো, সুভাষিণীর একখানা হাত তার হাতের উপর এসে পড়েছে।

বনহুর হাত থেকে দৃষ্টি ফেরালো সুভাষিণীর মুখের দিকে। একটু বিস্মিত হবার ভান করে বললো—কিছু বলবে সুভা?

সুভাষিণী হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বললো—কিছু না।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো—চলো এবার ফেরা যাক।

এমন সময় হঠাৎ একটা চীৎকার শোনা গেলো—বাবা গো, মেরে ফেললো গো।

বনহুর আর সুভা চমকে ফিরে তাকাতেই দেখলো, তাদের থেকে হাতকয়েক নিচে একটা সমতল জায়গায় দুটো লোক ধস্তাধস্তি করছে। একজনের হাতে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা, লোকটা চেষ্টা করছে দ্বিতীয় ব্যক্তির বুকে ছোরাখানা বসিয়ে দিতে।

তাদের পাশেই দাঁড়িয়ে একটি প্রৌঢ় মহিলা আর্ত চীৎকার করছে—বাবা গো, মেরে ফেললো গো, কে আছো বাঁচাও......বাঁচাও......

যেখানে লোক দুটো ধস্তাধস্তি করছে সেখানে চারপাশে কতগুলো লোক ভিড় করে দেখছে কিন্তু কেউ সাহসী হচ্ছে না তাকে উদ্ধার করে নেয় বা ওদের ঝগড়া থামিয়ে দেয়।

বনহুর হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেট দূরে নিক্ষেপ করে পা বাড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে সুভা পথ আগলে দাঁড়ালো—-কোথায় যাচ্ছো?

দেখছোনা, লোকটাকে এক্ষুণি হত্যা করে ফেলবে।

হঠাৎ যদি পাল্টা তোমাকে আক্রমণ করে বসে?

দেখা যাবে। বলে বনহুর দ্রুত এগিয়ে গেলো উঁচু-নীচু টিলার উপর দিয়ে। ভিড় ঠেলে যুদ্ধরত লোক দু'টোর পাশে এসে দাঁড়ালো।

লোকটা তখন দ্বিতীয় জনের বুকে ছোরা বিদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে। আর এক মুহূর্ত—চারদিকে গেলো গেলো রব উঠছে, খপ্ করে বনহুর ধরে ফেললো ছোরাসহ ক্রোধান্ধ লোকটার দক্ষিণ হাতখানা।

হাতে ভীষণভাবে চাপ দিলো বনহুর, সঙ্গে সঙ্গে লোকটির হাত থেকে খসে পড়লো সুতীক্ষ্ণধার ছোরাটা।

চারদিকে একটা আনন্দধ্বনি ফুটে উঠলো।

ক্রোধান্ধ লোকটা বনহুরের আচরণে গর্জন করে উঠলো। আক্রমণ করলো এবার সে বনহুরকে।

বনহুর প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো লোকটা কয়েক হাত নিচে।

আবার একটা আনন্দ ধ্বনি জাগলো জায়গাটাতে। বনহুরকে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা জড়িয়ে ধরলো আবেগভরে—কে তুমি বাবা, আমার সন্তানকে তুমি বাঁচিয়ে নিলে? আশীর্বাদ করি তুমি চিরসুখী হও।

বনহুর ফিরে এলো সুভাষিণীর কাছে—চলো সুভা সন্ধ্যা হয়ে এলো।

সুভাষিণী বনহুরকে দেখেছে—তার পৌরুষভরা চেহারা দেখেই সে মুগ্ধ হয়েছিলো। আজ স্বচক্ষে তার তেজোদ্দীপ্ত বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ লক্ষ্য করে অভিভূত হয়ে পড়লো সে। সত্যি এ লোকটি অদ্ভুত মানুষ।

সুভাষিণীর মুখে কোনো কথা নেই, চিত্রার্পিতের মত সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর অনুসরণ করলো ওকে।

হোটেলে ফিরে দেখলো, হরি রান্নাবান্না করে বসে আছে।

সুভা ভেবেছিলো বেটা পালিয়েছে, কিন্তু ফিরে এসেও যখন তাকে হোটেলকক্ষে বসে বসে ঝিমুতে দেখলো তখন একটা বিশ্বাস এলো তার মনে।

বনহুর আর সুভাষিণী হরির রান্না-করা ভাত-তরকারী খেয়ে খুশিই হলো।

খেতে খেতে বললো সুভা—সত্যি আমার বড্ড ভয় হয়েছিল।

কেন? বললো বনহুর।

সুভাষিণী বললো—লোকটা যেমন বলিষ্ঠ আর জোয়ান তারপর হাতে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা, আশ্চর্য তোমার শক্তির কাছে লোকটা যেন কেঁচো বনে গেলো একেবারে।

হরি ভাতের গ্রাস মুখে তুলছিলো, মাঝপথে ওর হাতখানা থেমে গেলো—কি বললেন আপামণি, সাহেব মারামারি করেছেন?

হেসে বললো বনহুর—নারে ও সব বাজে কথা, তুই খেয়ে নে।

হরি ভাবলো, তাই তো, এসব বাবুদের ব্যাপার—তার এতো মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি—খেতে শুরু করলো হরি।

খাওয়া-দাওয়া শেষে এবার ঘুমোবার পালা।

হরি বললো—আপামণি এবার আমি যাই?

ওকে পেয়ে সুভাষিণীর অনেকটা উপকার হয়েছে, বিদেশ বিভুঁই-হরিটা ছিলো বলেই না এতোটা নিশ্চিন্তভাবে বেড়াতে পারলো সে। আজ রাতে গিয়ে হরি যদি কাল আর ফিরে না আসে তাহলে খুব মুস্কিল হবে। তাই ওর চলে যাওয়ার কথা শুনে বললো—কাল আসবি তো?

আসবো, কিন্তু আমাকে রাতে অনেক দূর যেতে হবে, ফিরতে পারলে তো?

সেকি, হোটেলে জায়গা নেই?

ওরে বাবা, হোটেলে যত ভিড় কোথাও পিঁপড়ে শোবার জো-টি নেই।

তাহলে কি করবি? চিন্তিত কণ্ঠে বললো সুভাষিণী।

বনহুর বললো—যেতে দাও, যদি পারে আসবে, না পারে না আসবে। লোকের অভাব হবে না।

না, হরির মত ছেলে হয় না, একদিনেই দেখ কত আপন জন বনে গেছে। হরি, এখানে মেঝেতে শুনে পারবি?

তা পারবো। বললো হরি।

বনহুর বললো—শুধু মেঝেতে শোবে কি করে?

সুভাষিণী বললো—টাকা দিচ্ছি, একটা মাদুর কিনে আনতে পারবি?

খুব পারবো। দিদি, টাকা দিন।

সুভাষিণী টাকা দিলে চলে গেলো হরি, একটু পরে মাদুর নিয়ে ফিরে এলো—দিদিমণি দেখুন পাঁচসিকায় কত সুন্দর একটা মাদুর কিনে এনেছি।

বাঃ খুব সুন্দর তো? সুভাষিণী বললো।

বনহুর তখন নিজ শয্যায় দেহটা এলিয়ে একটা বই মেলে ধরলো চোখের সম্মুখে।

সুভাষিণী দরজার পাশে হরির মাদুরটা বিছিয়ে দিলো। একটা শাড়ী ভাঁজ করে বালিশ তৈরি করে দিয়ে বললো—তুই এখানে শো, কেমন?

হরি শুয়ে পড়লো নীরবে।

সুভাষিণী ওপাশের চৌকিটায় শুয়ে চোখ বন্ধ করলো। সারাটাদিন অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হওয়ায় অল্পক্ষণে ঘুমিয়ে পড়লো সুভাষিণী।

রাত বেড়ে আসছে।

বনহুরের শিয়রে লণ্ঠনটা দপদপ করে জ্বলছে, বই-এর পাতা উল্টে চলেছে সে।

ওদিকের খাটে সুভাষিণীর মৃদু নাসিকাধ্বনি হচ্ছে। সমস্ত হোটেল নীরব নিস্পন্দ। পথ থেকে দু'চার জন পথচারীর কণ্ঠ ভেসে আসছে। হয়তো বা দূরের কোনো পথিক ফিরে চলেছে গৃহে।

বনহুর বই বন্ধ করে টেবিলে রাখলো, তারপর হাত বাড়িয়ে আলোটা ডিম করে দিলো। এপাশ-ওপাশ করছে সে,—এক সময় শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো বনহুর।

হরিও ঘুমায়নি, সে চোখ খুলে পিটপিট করে তাকালো। বনহুর যখন শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো তখন তার নিশ্বাস দ্রুত বইছিলো।

বনহুর বাথরুমে প্রবেশ করলো; একটু পরে ফিরে এলো—সমস্ত দেহে তার জমকালো ড্রেস। সুটকেসটা খুলে বের করলো রিভলভারখানা; পকেটে লুকিয়ে ফেললো দ্রুতহস্তে। তারপর বেরিয়ে গেলো সে।

হরি উঠে পড়লো, ধীর পদক্ষেপে অনুসরণ করলো তাকে।

বনহুর সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে।

হরি রেলিং এর পাশে দাঁড়িয়ে ঝুকে দেখলো, তারপর ফিরে এলো নিজের শয্যায়।

বনহুর যখন ফিরলো তখন ভোরের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আলগোছে এসে শয্যা গ্রহণ করলো।

অনেক বেলা হলো বনহুরের ঘুম ভাঙছে না।

সুভাষিণী চা জল খাবার তৈরি করে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

এক সময় ঘুম ভাঙলো বনহুরের।

হেসে বললো সুভাষিণী—সমস্ত রাত জেগে ছিলে বুঝি?

বনহুর ভ্রু কুঁচকে বললো—গোটা রাত বই পড়ে কেটে গেছে সুভা।

ওঃ তাই বলি এতো ঘুম কেন? নাও, চা-জলখাবার খেয়ে নাও।

হরি শুধু মৃদু হাসলো।

পর পর কয়েকদিন হরি অবাক হলো, সুভাষিণী সেই যে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, গোটা রাত তার চেতনা হয় না। আর বনহুর প্রতি রাতেই বেরিয়ে যায় তার কালো ড্রেস পরে, ফিরে আসে রাত্রি শেষকালে।

হরি আজ রাতে খেতে বসে আড়নয়নে সব দেখছিলো। সুভাষিণী আর বনহুর পাশাপাশি খাচ্ছে। বনহুর খাওয়া শেষ করে পকেট থেকে একটু মসলা বের করে সুভাষিণীর হাতে দেয়—নাও।

যে কোন মেয়েই পান মসলা ভালবাসে, সুভাষিণীও ভালবাসে মসলা বিচুতে; খাওয়ার পর সে রোজ মসলা চিবোয়। হরি লক্ষ্য করেছে, প্রতিদিন খাওয়ার পরে বনহুর রুমালে মুখ মুছে নিজের পকেট থেকে একটা ছোট্ট কৌটা বের করে মসলা বের করতো তারপর একটু দিতো সুভাষিণীর হাতে।

সুভাষিণী মসলা মুখে ফেলে চিবুতে শুরু করতো।

বনহুর নিজেও একটু মুখে ফেলতো কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করতেই হরি বুঝতে পারলো বনহুর মসলা মুখে দেয়নি শুধু শুধু চিবুনোর ভান করেছে মাত্র।

মসলার সঙ্গে কোনো ঘুমের ঔষধ মেশানো আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে কারণেই সুভাষিণী প্রতি রাতে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকে একটিবার তার ঘুম ভাঙ্গে না।

সুভাষিণী যখন নীরবে ঘুমায় তখন বনহুর বেরিয়ে যায় কক্ষ ত্যাগ করে কোথায় যায়, কি করে—সেই জানে।

হরি কিন্তু প্রতিদিন লক্ষ্য করে বনহুরের এই অদ্ভুত আচরণ। একদিন গভীর রাতে বনহুর বেরিয়ে গেলো, ফিরে এলো ভোরবেলায়। সুভাষিণী না জানলেও হরির মনে সন্দেহ জাগে, লোকটা রোজ কোথায় যায়, কি করে সে?

❑

আজ ক'দিন হলো যাদবগঞ্জের অদূরে নারুন্দি জঙ্গলের মধ্যে গভীর রাতে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে থাকে। সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাথায় জটা, মুখে দাড়ি, চোখের পাতার লোমগুলোও পেকে সাদা হয়ে গেছে। বাঘের চামড়ায় উপবিষ্ট বাবাজী; চোখ মুদ্রিত অবস্থায় বসে যজ্ঞমন্ত্র আবৃত্তি করে চলেছেন। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের আলোকে আলোকিত বনভূমি। সন্ন্যাসী বাবাজীর জটাজুট-আবৃত ললাটে সিন্দুর আর চন্দনের তিলক। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, হাত এবং কব্জীতেও রুদ্রাক্ষের মালার ছড়া। অদ্ভুত দীপ্তময় সন্ন্যাসী বাবাজী শুধু সাধকই নয়, জ্যোতিষীও বটে।

যাদবগঞ্জ এবং আশে-পাশের গ্রামাঞ্চলের লোকজনের মধ্যে এক সাড়া পড়ে গেছে। গভীর রাতে এ সন্ন্যাসীর অলৌকিক আবির্ভাব সকলের মনে জাগিয়ে তুলেছে এক বিস্ময়।

ধূমকেতুর মতই আবির্ভাব ঘটেছে এ সন্ন্যাসীর, তাই সবাই এ সন্ন্যাসীকে ধূমকেতু বাবাজী বলতে শুরু করেছে। অদ্ভুত গণনাশক্তি ধূমকেতু সন্ন্যাসীর। এ অঞ্চলের লোকজন ছাড়াও দূর দূর স্থান হতেও লোকজন আগমন শুরু করেছে তাঁর চরণসেবায়।

কিন্তু দিনে এ সন্ন্যাসীকে দেখতে পায় না, গভীর রাতে হয় তার আগমন। সন্ধ্যা হতেই বনভূমি মুখর হয়ে উঠে, দূর দূরান্ত থেকে আসে সব ভক্তগণ। যার যা মনোবাসনা ব্যক্ত করে ধূমকেতু বাবাজীর সম্মুখে।

সন্ন্যাসী বাবাজী যোগাসনে বসে মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং বলে দেন সকলের মনের কথা। রাজা-প্রজা সবাই এখানে সমান, সকলকেই মৃত্তিকা আসনে উপবিষ্ট হয়ে সন্ন্যাসী বাবাজীর হস্ত চুম্বন করতে হয়।

সন্ন্যাসী বাবাজী কিছুক্ষণ ধ্যানগ্রস্তের মত তাকিয়ে থাকেন তাঁর সম্মুখস্থ ব্যক্তির দিকে, তারপর বলেন কি জন্য আগমন হয়েছে তার।

কেউ আসে তার অসুস্থতার আরোগ্য কারণে, কেউ আসে নিঃসন্তান হয়ে সন্তান কামনায়, কেউ আসে মামলা-মোকদ্দমা ব্যাপার নিয়ে, কেউ আসে স্ত্রীর ভালবাসার জন্য তাবিজ গ্রহণে। নানা জনের নানারকম মনোবাঞ্ছনা, কিন্তু সবাইকে সন্ন্যাসী বাবাজী হাসিমুখে ঔষধ বিতরণ করে চলেছেন। কেউ চির অসহায় আসে ধনবান হওয়ার আশায়। সন্ন্যাসী বাবাজী কাউকে বিমুখ করেন না। প্রচুর অর্থদান করেন তিনি সেই অনাথ দুঃস্থ জনগণকে। দেশব্যাপী ধূমকেতু বাবাজীর সুনাম। মাত্র ক'দিন তাঁর আগমন, তাতেই নারুন্দী জঙ্গল লোকালয়ে পরিণত হয়েছে।

যাদবগঞ্জের তরুণ জমিদার মধুসেনও একদিন জানতে পারলেন, তাঁর অঞ্চলের অনতিদূরে নারুন্দী জঙ্গলে এক মহান সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটেছে। সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ক্ষমতা, যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো বাসনা নিয়ে সন্ন্যাসী বাবাজীর কাছে হাজির হলে তার সে বাসনা সিদ্ধ হয়।

মধুসেন একদিন রাতে হাজির হলেন একশত স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে সন্ন্যাসী বাবাজীর চরণতলে। সুভাষিণীকে হারানোর পর থেকে তার সংসারে শৈথিল্য এসেছে। বৃদ্ধা মা ছিলেন—তাকেও হত্যা করেছিলো নরপিশাচ মঙ্গল ডাকু। পিতা সমতুল্য শ্বশুড় মহাশয় বজ্রবিহারী রায় এবং তার স্ত্রীকেও হত্যা করেছিলো শয়তান, তাছাড়াও হত্যা করেছিলো আরও কর্মচারিগণকে। তারপর থেকে মধুসেন কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েছিলেন।

মঙ্গল ডাকু যখন সুভাষিণী ও তাকে বেঁধে নৌকাযোগে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন সে নৌকা থেকে নদীপথে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেছিলো কিন্তু বাড়ি ফিরে অনুশোচনায় মুষড়ে পড়েছিলো মধুসেন। এ বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকাই বুঝি ছিলো শ্রেয়। কারণ তার জীবনসঙ্গিনী সুভাষিণী ডাকাত কর্তৃক লুণ্ঠিতা। যার স্ত্রী গৃহচ্যুতা তাঁর মত কলঙ্কময় জীবন বুঝি আর কারো নেই।

মধুসেন সুভাষিণীকে হারানোর পর অনেক সন্ধান করেছে কিন্তু কোথাও মঙ্গল ডাকুর খোঁজ পায়নি। মাধবপুরের পুলিশ বিভাগ এ ডাকুর সন্ধানে বিভিন্ন দেশে সি-আই-ডি পুলিশ নিযুক্ত করেছিলো কিন্তু শেষ অবধি ব্যর্থ হয়েছে তারা।

মধুসেন সুভাষিণীর আশা একরকম ত্যাগই করেছে, কিন্তু যতই তাকে ভুলতে চেয়েছে ততই গভীরভাবে মনে আলোড়ন জেগেছে, অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করেছে মনে সে।

প্রিয়ার বিরহে পৃথিবীটা যেন তার কাছে একেবারে নিরানন্দময় মনে হয়েছে, সহচরগণ বলেছে পুনরায় বিয়ে করতে। আত্মীয়-স্বজন বলেছেন ডাকাত-হরণ করা বৌ-এর চিন্তা দূর করে নতুন একজনকে গৃহলক্ষ্মী করে ঘরে আনতে। প্রজাগণ বলেছে নতুন রাণীমা এনে তাদের মনে আনন্দ দিতে। কিন্তু মধুসেন পারেনি কারো কথা রাখতে, আজও সে সুভাষিণীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। তার মন বলছে, তার সুভা ভাল আছে, বেঁচে আছে—আবার ফিরে আসবে।

কিন্তু ফিরে এলে সমাজ তাকে গ্রহণ করবে না, মধুসেন তার মহান হৃদয়ের পরিচয়ে গ্রহণ করতে পারে, সে জানে—সুভাষিণী তার এ কলঙ্কময় জীবনের জন্য দায়ী নয়। নিষ্পাপ সে, কেন তাকে বঞ্চিত করবে তার ভবিষ্যৎ জীবন থেকে।

কত কি না ভেবেছে মধুসেন কিন্তু সমাধান খুঁজে পায় নি। আজ মধুসেন একশত স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে হাজির হলো ধূমকেতু সন্ন্যাসী বাবাজীর নিকটে।

অগ্নিকুণ্ডের আলোতে মধুসেনের মুখমণ্ডল বড়ই করুণ লাগছিলো, একশত স্বর্ণমুদ্রা সন্ন্যাসী বাবার পাদমূলে স্থাপন করে করজোড়ে বললো—বাবাজী, আমার বাসনা পূর্ণ হবে কি?

সন্ন্যাসী বাবাজী তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন মধুসেনের মুখে। দীপ্ত উজ্জ্বল হলো তার চোখ দুটো, কিছুক্ষণ চক্ষুদ্বয় মুদিত রেখে অস্ফুট গম্ভীর কণ্ঠে বললো—বৎস, তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।

পূর্ণ হবে? বাবাজী আমি যাকে চাই তাকে আবার ফিরে পাবো?

পাবে। কিন্তু সে যেখানে আছে সেখানে কোনো মানুষ প্রবেশ করতে পারে না। কঠিন দুর্গম স্থানে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

বাবাজী, তাকে কি করে পাবো তাহলে, বলুন?

বললাম তো, তাকে পাবে কিন্তু সাধনা করতে হবে তোমাকে।

যে সাধনা আমাকে করতে বলবেন তাই করবো। বাবাজী, গ্রহণ করুণ এ একশত স্বর্ণমুদ্রা।

বৎস, আমার যোগ নষ্ট করো না। কোনো জিনিসই আমি গ্রহণ করি না।

আমার এ স্বর্ণমুদ্রাগুলো শুধু নিন বাবাজী।

সম্ভব নয় বৎস, তুমি ওগুলো ফেরত নিয়ে যাও।

তাহলে আমার বাসনা সিদ্ধ----

হবে।

বাবাজী---বাবাজী---

কিন্তু তোমাকে সাধনা করতে হবে।

বলুন কি করবো?

তিন দিন, তিন রাত্রি তুমি তোমার স্ত্রীর নাম জপ করবে—আমি একটা ঔষধ দেবো, সে ঔষধ তিন দিন, তিন রাত্রির শেষ রাত্রিতে সেবন করবে।

তাহলে কি হবে বাবাজী?

ঐদিন নির্জন ঘরে তুমি একা শয়ন করবে—মনে রেখো দরজা বন্ধ করো না।

বাবাজী, আমি যদি আপনার উপদেশ পালন করি তাহলে কি আমার সুভাষিণীকে পাবো।

হাঁ বৎস পাবে। যাও আজ থেকে সাধনা শুরু করবে, যাও। এই নাও এ বড়িটা তিন দিন, তিন রাত্রির শেষ রাতে ভক্ষণ করবে।

মধুসেন বড়িটা হাতে নিয়ে কপালে ঠেকালো।

❑

প্রতিদিনের মত আজও বনহুর শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো। বাথরুমে প্রবেশ করে ড্রেস পরিবর্তন করে নিলো, জমকালো ড্রেসে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে।

হরি মাথা উঁচু করে একটু দেখে নিলো। বাবুকে সে প্রতিদিন গভীর রাতে হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে,—কোথায় যায়, আবার ভোর রাতে ফিরে আসে।

আজ হরি দেখলো, বাবু বাথরুম থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেলো সুভাষিণীর বিছানার দিকে। একটা রুমাল বের করলো পকেট থেকে। সুভাষিণীর নাকে রুমালটা চেপে ধরলো বাবু। তারপর সুভাষিণীর নিস্তব্ধ দেহটা তুলে নিলো হাতের উপর।

হরি শিউরে উঠলো।

বাবু তখন সুভাষিণীর সংজ্ঞাহীন দেহটা হাতের উপর নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে।

হরি আজ অপেক্ষা করতে পারলো না, সেও তার পেছনে নেমে এলো। বাবু সুভাষিণীর দেহটাকে শুইয়ে দিলো অদূরে অন্ধকারে থেমে থাকা একটা গাড়ির পিছন আসনে। তারপর সে চেপে বসলো ড্রাইভ আসনে। যেমন গাড়িতে ষ্টার্ট দিতে যাবে অমনি হরি বলে উঠলো—বাবু।

চমকে উঠলো বনহুর—কি রে হরি তুই?

হাঁ, বাবু আমাকে সঙ্গে নিন, নইলে চেঁচাবো।

বনহুর কি যেন ভাবলো তারপর বললো—আমার সঙ্গে গেলে তুই বিপদে পড়বি।

বয়েই গেলো, আমি বিপদকে ভয় করি নাকি?

এই নে বখশীস, তবু চেঁচাবি না, বুঝলি? বাবু পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে দিতে গেলো ওর হাতে।

হরি হাত গুটিয়ে নিয়ে বললো—আমাকে সঙ্গে না নিলে আমি চেঁচাবোই-

তা হলে ছাড়বি না?

না বাবু, আমি যাবোই---

তবে উঠে আয়, কাজ নেই চীৎকার করে, কিন্তু মনে রাখিস্ একটু এদিক ওদিক হলেই মরবি।

বনহুরের পাশে উঠে বসলো হরি, যেন সে খুশি হয়েছে।

গাড়ি এবার উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

ভগবৎগঞ্জের জনমুখর রাজপথ এখন নির্জন নিস্তব্ধ। কে মনে করবে দিনের বেলায় এ পথে পিপীলিকা প্রবেশেও অক্ষম হয়।

বনহুর গাড়ি নিয়ে ছুটে চলেছে, হরি তার পাশে। পিছন আসনে সুভাষিণীর জ্ঞানহীন দেহ।

এত বেগে গাড়িখানা চলছিলো, অল্পক্ষণেই ভগবৎগঞ্জ শহর পেরিয়ে বাইরে এসে পড়লো তারা। হরি ঘুমে ঝিমুচ্ছিলো, ঝাকুনি খেয়ে সজাগ হয়ে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে গাড়ির বাইরে ছুটে চলা অস্পর্শীয়মান বৃক্ষলতাগুল্মোর দিকে।

না জানি কোথায় চলেছে বাবু কে জানে।

এক সময় বললো হরি—বাবু, দিদিমণিকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

তার স্বামীর কাছে।

বাবু!

হাঁ হরি।

কোথায় যাবেন? কোথায় দিদিমণির স্বামীর বাড়ি?

এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে মাধবপুরে।

মাধবপুর?

হাঁ, তুই এলি কেন বলতো?

বাবু, আপনাকে ছাড়া কোথায় যাবো, আপনি আমাকে একশত করে টাকা দেন, এতো টাকা আর তো কেউ দেবে না বাবু।

পারবি আমার সঙ্গে থাকতে?

কেন পারবো না বাবু? সব পারবো।

আমার সঙ্গে থাকবি কিন্তু একটি কথাও কাউকে বলবি না।

না না, এই যে কান ধরে বলছি, বলবো না—বলবো না বাবু।

বেশ তবে চুপ চাপ বসে থাক্।

বাবু, এ গাড়িখানা কার?

বেশি প্রশ্ন করবি না।

আচ্ছা বাবু।

গাড়িখানা নানারকম উচু নীচু পথে এখন চলেছে। শহর ছেড়ে নির্জন পথ, তারপর প্রান্তর, প্রান্তরের পর গ্রাম।

বনহুর বললো—এটাই হলো মাধবপুর গ্রাম, এর পরেই যাদবগঞ্জ।

হরি অবাক হয়ে বললো—যাদবগঞ্জ সে কোন্ গ্রাম?

তোর সুভা দিদির স্বামীর বাড়ি।

এক সময় যাদবগঞ্জে পৌঁছে গেলো গাড়িখানা। একটা পুরোন জমিদার বাড়ির সম্মুখে গাড়ি রাখলো বনহুর। তখন শেষ প্রহর রাত।

বনহুর সুভাষিণীর দেহটা হাতের উপর তুলে নিলো, তারপর সদর গেট পেরিয়ে প্রবেশ করলো অন্তঃপুরে।

হরিকে গাড়িতে বসে থাকতে বললো বনহুর।

হরি কিন্তু বনহুরের কথা না শুনে চুপি চুপি অনুসরণ করলো বনহুরকে।

বনহুর সুভাষিণীর সংজ্ঞাহীন দেহটা নিয়ে এগিয়ে চলেছে—পরপর কয়েকটা গেট পেরিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলো সে। চারদিক নিস্তব্ধ, সমস্ত বাড়িটা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে—যেন ঘুমন্ত রাজপুরী।

জমকালো ড্রেসে সজ্জিত বনহুর এগুচ্ছে, তার হস্তদ্বয়ের উপর সুভাষিণীর সংজ্ঞাহারা দেহ। ওদিকের বড় ঘরটার দরজায় দাঁড়িয়ে পা দিয়ে ঠেলে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেলো। বনহুর প্রবেশ করলো ভিতরে।

সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ।

দুগ্ধ-ফেননিভ শুভ্র বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে মধুসেন। সন্ন্যাসীর দেওয়া ঔষধ সে আজ ভক্ষণ করেছে। তাই সে ঘুমে অচেতন।

বনহুর সুভাষিণীর সংজ্ঞাহীন দেহটা নিয়ে মধুসেনের খাটের পাশে এসে দাঁড়ালো, আলগোছে শুইয়ে দিলো সে তার স্বামীর পাশে।

আড়ালে আত্মগোপন করে সব দেখলো হরি, বাবুর প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে এলো তার মাথাটা। বাবু বেরিয়ে আসার পূর্বেই সে গাড়িতে গিয়ে বসলো, মিছামিছি আসনে ঠেস দিয়ে বসে ঝিমুতে লাগলো।

ফিরে এলো বনহুর, হরিকে গাড়ির মধ্যে দেখে বললো—হরি!

চমকে জেগে উঠার ভান করে সোজা হয়ে বসলো হরি—বাবু আপনি ডাকছেন?

ঘুমিয়ে পড়েছিস?

না বাবু, একটু ঝিমুচ্ছিলাম।

চল্।

কাজ শেষ হয়েছে? মানে দিদিমণিকে তার স্বামীর কাছে---

হাঁ পৌঁছে দিয়েছি।

কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাবু?

অতো বুঝে তোর কাজ নেই, চুপ চাপ শুধু দেখে যা।

❑

বনহুর ফিরে এলো হোটেলে

তখন ভোর হয়ে গেছে।

শূন্য কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর মাথার পাগড়ীটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বিছানার উপর, তারপর বসে পড়লো শয্যায়। তার মুখে ফুটে উঠেছে এক তৃপ্তির ভাব, কাজ শেষে ক্লান্ত শ্রমিক যেমন মুক্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে তেমনি।

হরি বললো—বাবু, চা তৈরি করবো?

অন্যান্যদিন এতোক্ষণ সুভাষিণী চা, জলখাবার তৈরি করে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়, আজ সুভা নেই—বনহুরের চোখ দু'টো তার অজ্ঞাতেই ছলছল করে উঠলো। মুখটা ফিরিয়ে হরির কাছে আত্মগোপন করে নিয়ে বললো—চা করতে পারবি হরি?

পারবো বাবু।

তবে কর, আমি কাপড়-চোপড় পাল্টে ফেলি।

হরি ষ্টোভ ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বনহুর জামা-কাপড় পাল্টে, হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় এসে বসে।

হরি চা আর এক থালা গরম পুরি-তরকারী এনে সম্মুখে রাখে—বাবু, খেয়ে নিন।

বনহুর সম্মুখস্থ টেবিলে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলে—এতো করলি কখন?

হাতের মধ্যে হাত কচলায় হরি—বাবু, ঘরে সব ছিলো—ময়দা, ঘি, আলু, পোটল চট্‌পট করে নিয়েছি। এবার খেয়ে নিয়ে ঘুমান।

হাঁ, ঘুমাবো। বনহুর নাস্তার থালা টেনে নিয়ে খেতে শুরু করে। সারা রাত্রির পরিশ্রান্ত বনহুর তৃপ্তি সহকারে খায়। খাটি ঘিয়ে টাট্‌কা ভাজা গরম পুরি আর আলু পটলের ভাজি বড় খাসা লাগে তার কাছে। খেতে খেতে বলে বনহুর—হরি, সত্যি তুই এতো সুন্দর রান্না করতে পারিস আগে জানতাম না।

বাবু, মায়ের কাছে সব শিখে নিয়েছি। বিদেশ বিভুঁয়ে থাকি, পরের বাড়ি খেটে খেতে হয়। সব না জানলে লোকে মাইনে দেবে কেন?

হরি টাকার প্রয়োজন হলে বলবি? মাকে টাকা পাঠিয়ে দিবি, বুঝলি?

আচ্ছা বাবু।

বনহুরের নাস্তা খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো, হরি ততক্ষণে এককাপ গরম চা এনে তার সম্মুখে রাখে।

বনহুর চায়ের কাপ তুলে নেয় হাতে।

বাবুকো চা-নাস্তা খাইয়ে হরি বাজারের থলে হাতে এসে দাঁড়ালো—বাবু, টাকা দিন, আমি এ বেলা বাজার সেরে আসি।

হেসে বললো বনহুর—তুই দেখছি সংসার পেতে বসলি। কি দরকার ছিলো রান্না করার—হোটেল থেকে আনলেই পারতিস্?

তা হয় না বাবু, আপনি তো জানেন না তীর্থস্থানের হোটেলের পাক কেমন—একেবারে বিশ্রী, খাবারগুলো যেন গরুর জাবর। মাছি উড়ছে বন্ বন্ করে, দেখলেই ঘেন্না হয়। হঠাৎ কি অসুখ-বিসুখ করে বসবে কে জানে। রোজ তো কলেরা আর বসন্ত লেগেই আছে এসব শহরে---

হরি যেন পাকা গিন্নীর মত কথাগুলো বলে চলেছে। বনহুর পকেট থেকে কয়েকটা টাকা বের করে হাতে দেয়—যা, খুশিমত দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে আয়।

বাজারের থলে হাতে বেরিয়ে যায় হরি।

বাজার করে ফিরে আসতে একটু বিলম্ব হয়ে যায় হরির, কারণ তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে বাজার করাটা একটা সমস্যা। অনেক কষ্টে দরকারী জিনিসগুলো কিনে নিয়েই চলে এসেছে সে—আজ সুভা দিদিমণি নেই, পাক করতে হবে তাকেই।

ঘরে ঢুকেই অবাক হলো হরি, দেখলো বাবু খাটে হেলান দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে, তার কোলের উপর বইখানা খোলা পড়ে আছে।

হরি বুঝতে পারলো গোটারাতের অনিদ্রায় বাবুর চোখে ঘুম জেকে বসেছে। বাজারের থলেটা রেখে হরি সরে এলো। বাবুর মাথার নিচে বালিশটা ঠিক করে দিয়ে একটা চাদর চাপা দিলো তার দেহে। বইখানা বন্ধ করে টেবিলে রাখলো।

হরি ব্যস্ত হয়ে পড়লো রান্নার কাজে—হাত পুড়ে ফেললো, কেটেও গেলো মাছ কুটতে খানিকটা, তবু সে ক্ষান্ত হলো না, দ্রুত হাত চালিয়ে পাক শেষ করে নিলো।

রান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় পাশ ফিরতে গিয়ে ঘুম ভেংগে গেলো বনহুরের, সোজা হয়ে বসলো ধড়ফড় কিন্তু একি, তার মাথার তলায় বালিশ দিলো কে, চাদরখানাই বা গায়ে এলো কি করে। বনহুর তাকালো—ঘরের ওপাশে হরি তখন রান্না নিয়ে মেতে উঠেছে।

বনহুর চাদর সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো, বুঝতে পারলো এ সব হরির কাজ। একটা মায়ার উদ্বেগ হলো বনহুরের মনে, ছোকরা তাহলে তাকে শুধু শ্রদ্ধাই করে না—ভালও বাসে।

বনহুর হরির পিছনে এসে দাঁড়ালো—কি করছিস হরি?

চোখেমুখে কালি লেগেছে, হাতে মরিচ-বাটা, ফিরে তাকালো—বাবু, সব হয়ে গেছে, আপনি স্নান করে আসুন,শুধু বড়াটা ভাজবো।

সে কিরে, এরি মধ্যে সব রেঁধে ফেলেছিস? তুই তো দেখছি বড় কাজের লোক। আরে! আংগুলে কি হয়েছে?

হরির আংগুল কেটে গিয়েছিলো, খানিকটা ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে নিয়েছিলো সে আংগুলটাকে। হাতখানা লুকাতে চেষ্টা করে বললো—কিছু না।

দেখি দেখি --- বনহুর ওর হাতখানা ধরে ফেললো।

হরি লজ্জিত হয়ে বললো—গরীব মানুষ আমরা, অমন কত কেটে থাকে।

বনহুর আংগুলে ঔষধ লাগিয়ে বেঁধে দিলো যত্ন সহকারে।

বাথরুমে স্নান করতে প্রবেশ করলো বনহুর।

হরি ততক্ষণে খাবার তৈরি করে টেবিলে সাজিয়ে রাখলো।

খেতে বসে বললো বনহুর—হরি, এখানে আর মাত্র ক'টাদিন আছি, তারপর চলে যাবো—সত্যি মনে থাকবে তোর কথা।

বাবু, আমার তো কেউ নেই, আমাকে সঙ্গে নিলে হয় না?

কেন রে, তোর মা আছে না? মাকে ছেড়ে আমার সঙ্গে যাবি?

বাবু মিছে কথা।

মিছে কথা? তার মানে?

বাবু আমার কেউ নেই।

তবে যে বলিস দেশে তোর মা আছে?

ও কথা না বললে লোকে আমাকে মাইনে দেয় না। বলে কি জানেন বাবু?

কি বলে?

বলে মাইনে নিয়ে কি করবি? চিরদিন আমাদের এখানে থাক—তোকে বিয়েথা করিয়ে সংসারী করবো। শুধু খাটবি, আর খাবি, পারবি—বাস্। বলুন তো বাবু, আমার পয়সার দরকার হয় না?

ওঃ তাই বুঝি মায়ের কথা বলে---

হাঁ বাবু, আপনি তো আমাকে ঠকাবেন না, তাই সত্যি কথা বললাম।

সত্যি কথা বললি—এখন থেকে আমি যদি তোকে মাইনে না দেই?

আপনি আমাকে ফাঁকি দেবেন না জানি বাবু।

তার উপরে হরির বিশ্বাস দেখে মুখ টিপে হাসলো বনহুর। মনে মনে ভাবলো, যে ক'দিন এখানে আছে থাক তারপর কিছু টাকা দিয়ে সরে পড়তে হবে, না হলে এদেশে একে নিয়ে কি করবে সে।

হরি কিন্তু একেবারে নিজের মত মনোযোগ দিয়ে কাজকর্ম করতে লাগলো—কিসে বাবু সন্তুষ্ট থাকবে, কিসে তার কোনো অসুবিধা হবে না, এ দিকে সর্বদা খেয়াল তার।

বাইরে যাবার সময় হরি তাকে জামা-কাপড় এগিয়ে দেয়, জুতো ব্রাশ করে দেয়, সিগারেট বাক্সটা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় সে তার হাতে। আবার

বাইরে থেকে ফিরে এলে নিজের হাতে বাবুর জামা-কোট খুলে নেয়, এমনকি জুতোটাও সে খুলে নেয়।

বনহুর হেসে বলে—এতো করিস হরি তুই আমার জন্য! তোর মায়া দেখছি ছাড়া মুস্কিল।

হরি শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

❑

মধুসেন জেগে উঠতেই পাশে সুভাষিণীকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখে শুধু বিস্মিতই হলো না, আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠলো, তার সাধনা তাহলে ব্যর্থ হয়নি। মধুসেন তার প্রিয়তমা পত্নীকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে—সুভা, সুভা---

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো সুভাষিণী, প্রথমে সে মনে করলো স্বপ্ন দেখছে কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝতে পারলো—স্বপ্ন নয় সত্য। একি, তার স্বামীর বাহুবন্ধনে সে এলো কি করে! অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সুভাষিণী।

মধুসেন আবেগভরা কণ্ঠে বললো—সুভা, অমন করে তাকিয়ে আছে কেন? আমাকে চিনতে পারছো না?

হাঁ পারছি, কিন্তু আমি কোথায় এখন?

তোমার স্বামীর বাড়ি যাদবগঞ্জে।

আমি যাদবগঞ্জে? কি করে এলাম আমি এখানে?

সব সেই ধূমকেতু সন্ন্যাসী বাবাজীর কৃপায়। সুভা, তোমাকে যে ফিরে পাবো সে আশা আমার ছিলো না। ভগবানের দয়া আর সন্ন্যাসী বাবাজীর সাধনায় তোমাকে লাভ করলাম।

কিন্তু আমি এখানে এলাম কি করে?

বললাম তো, সব সেই সন্ন্যাসী বাবাজীর দয়া। সুভাষিণী—আমার সুভা, তোমাকে হারিয়ে আমি বিশ্ব অন্ধকার দেখছিলাম।

সুভাষিণী বললো—আমাকে তুমি গ্রহণ করেছো এ যে আমার পরম সৌভাগ্য।

সুভা, ভুলে যাও সব কথা, আমার কাছে তুমি অপবিত্র নও কারণ তুমি নিজের দোষে নয়, দৃস্কৃতি শয়তানের দোষে কুলহারা গৃহত্যাগী হয়েছিলে—তোমাকে আমি কোনোদিন অবহেলা করবো না।

সুভাষিণীর কাছে সন্ন্যাসীর সব কথা ব্যক্ত করে মধুসেন, বলে, আমি তাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি গ্রহণ করেননি। সুভা, তিনি মানুষ না—দেবতা।

সব বুঝতে পারে সুভাষিণী, সন্ন্যাসী বেশে দেবতা কে তা তার কাছে অজ্ঞাত থাকে না।

মধুসেন বলে—সুভা, তোমাকে পেয়েছি—এ যে আমার কত বড় আনন্দ! আজ রাতে আমি আর তুমি যাবো তার চরণ দর্শনে। যাবে সুভা?

যাবো, যার দয়ায় আমাদের এ মিলন তার চরণে প্রণাম না করে আমি যে স্বস্তি পাবো না।

সমস্ত দিন ধরে সুভাষিণী ভাবলো, কত কথাই না মনে পড়লো তার। সেই ঝাঁম জঙ্গলের ভূগর্ভস্থ আস্তানা—তার বন্দী অবস্থা—মঙ্গল ডাকুর নির্মম অকথ্য অত্যাচার—হঠাৎ একদিন তার রক্ষাকারী বেশে বনহুরের আবির্ভাব—অন্যান্যের সঙ্গে তাকেও উদ্ধার—তারপর ঝাঁম শহরে নতুন করে পরিচয় লাভ বনহুরের সঙ্গে —পরে তাকে নিয়ে ভগবৎগঞ্জে আগমন—হোটেলে আশ্রয়—সেখানের দিনগুলো আজ গভীরভাবে তার মনে উদয় হতে লাগলো।

গভীর রাতে নারুন্দী জঙ্গলের অভ্যন্তরে জ্বলে উঠলো অগ্নিকুণ্ড দপ্ দপ্ করে। অগ্নিকুণ্ডের পাশে ব্যাঘ্র চামড়ায় উপবিষ্ট এক তেজোদ্দীপ্ত জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ।

অগণিত ভক্ত পরিবেষ্টিত সন্ন্যাসী বাবাজী চক্ষুদ্বয় মুদিত করে মহামন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে।

মধুসেন আর সুভাষিণী করজোড়ে সন্ন্যাসী বাবাজীর চরণতলে উপস্থিত হলো।

মধুসেন বললো—বাবাজী, চক্ষুদ্বয় মুক্ত করুন, দেখুন আমি সুভাষিনীকে ফিরে পেয়েছি।

সন্ন্যাসী বাবাজীর চক্ষুদ্বয় উন্মোচিত হলো, তাকালেন তিনি সম্মুখস্থ ভক্তদের দিকে। মধুসেনের পাশে উপবিষ্টা শুভ্রবসনা ললাটে সিঁদুরের আলপনা দু'চোখ মুদিত সুভাষিণীকে দেখতে পেলেন। সুভাষিণীর গণ্ড বেয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে চলেছে। করজোড়ে বসে আছে সে সন্ন্যাসী বাবাজীর সম্মুখে।

সন্ন্যাসী বাবাজী বললেন—বৎস, আশীর্বাদ করি তোমাদের বাসনা পূর্ণ হউক।

মধুসেন এবার বললো—চলো সুভা ফিরে যাই?

সুভা সন্ন্যাসীর চরণধুলি মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মদুসেনের সঙ্গে ফিরে যায় সে নিজ বাড়িতে।

শয্যায় শয়ন করেও ঘুমাতে পারে না সুভা।

মধুসেন ঘুমিয়ে পড়েছে তার পাশে।

নিঝুম হয়ে পড়েছে এখন সমস্ত বাড়িখানা। প্রহরীরাও ঘুমিয়ে পড়েছে নিজ নিজ খাটিয়ায়।

সুভাষিণী শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ায়, এলায়িত কেশরাশি, বেরিয়ে আসে বাইরে, মন্দিরের দরজা খুলে ফুলের ডালা তুলে নেয় হাতে, তারপর দ্রুত এগিয়ে চলে তাদের বাড়ির অনতিদূরে নারুন্দী জঙ্গল অভিমুখে।

সন্ন্যাসী তখনও ধ্যানমগ্ন।

সম্মুখে তার অর্ধ-নির্বাপিত অগ্নিকুণ্ড।

ভক্তের দল চলে গেছে নিজ নিজ আবাসে।

এলায়িত চুল, শুভ্র বসন হস্তে ফুলের ডালা সন্ন্যাসীর পাদমূলে এসে করজোড়ে বসলো।

চমকে উঠলো সন্ন্যাসী, কিন্তু কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করলো না। সুভাষিণী ফুলগুলো সন্ন্যাসীর চরণতলে ঢেলে দিয়ে বললো— নিষ্ঠুর দেবতা, কাজ তো শেষ করেছো, কেন আবার ছলনা? অনেক ব্যথা দিয়েছো, আর সহ্য করতে পারি না দেব।

সন্ন্যাসীর কণ্ঠ গম্ভীর—সুভা।

না না, আর তুমি এসো না।

সুভা, তোমার মঙ্গল কামনাই যে আমার ব্রত, আমার ধর্ম।

বেশ, তোমার ধর্ম তুমি পালন করেছো আমাকে তুমি শাস্তি দিতে পারবে না।

শাস্তি?

হাঁ, নারুন্দী বনে আর তুমি আসবে না। তোমার আগমনে আমি উন্মাদিনী হয়ে উঠি। মনকে আমি কিছুতেই ধরে রাখতে পারি না।

সুভা, ভুলে যাও সব কথা—ভুলে যাও।

না না, আমি কোনোদিন তোমাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারবো না।

ছিঃ তুমি বড্ড অবুঝ হচ্ছো সুভা, দস্যু বনহুরকে কেউ কোনো দিন মনে স্থান দিতে পারে না, যারা তাকে ভালবেসেছে তারাই ভুল করেছে। যাও, যাও সুভা, স্বামীকে ভালবেসে নারীধর্ম সার্থক করো।

সুভাষিণী আঁচলে অশ্রু মুছে উঠে দাঁড়ালো।

❑

হরি, সব গুছিয়ে নে, এবার যেতে হবে।

কেন বাবু, কাজ শেষ হয়েছে?

হাঁ রে, কাজ শেষ হয়েছে।

বাবু, আমিও যাবো আপনার সঙ্গে।

আমার সঙ্গে তোর খুব কষ্ট হবে কিন্তু।

সব আমি সইতে পারি।

বনহুর ভাবলো, এমন একটা ছেলে তার সঙ্গে থাকলে মন্দ হয় না। তাছাড়া হরি বেশ চাপা ছেলে, আজ পর্যন্ত তার কত বিস্ময়কর কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছে কিন্তু একটি কথাও সে কারো কাছে প্রকাশ করেনি।

সত্যিই হরি ছিলো অত্যন্ত বিশ্বাসী আর প্রভুভক্ত।

শেষ পর্যন্ত বনহুর হরিকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হলো।

জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে বললো হরি—বাবু, এবার কোথায় যাবেন?

বনহুর একটু চিন্তা করে বললো—পূর্ব পাকিস্তানে।

অবাক হয়ে বললো হরি—বাবু, পূর্ব পাকিস্তান সেতো মুসলমানের দেশ?

হাঁ, পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্রই বটে। বললো বনহুর।

❑

একদিন বনহুর আর হরি ঢাকা তেজগাঁ বিমান বন্দরে এসে পৌঁছলো। ঢাকা বনহুরের কাছে সম্পূর্ণ নতুন দেশ। এখানের লোকজন সবাই তার অপরিচিত, কাউকে সে চেনে না, কেউ তাকেও জানে না।

বনহুরের হস্তে এ্যাটাচী ব্যাগ আর হরির হস্তে স্যুটকেস।

এরোড্রাম থেকে বেরিয়ে এলো বনহুর আর হরি। নতুন শহরটা নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। বনহুরের দেহে স্যুট, চোখে গগলস্। পথের ধারে এসে দাঁড়ালো, অগণিত ট্যাক্সি, বাস, ট্রাক, বেবী ট্যাক্সি ছুটে চলেছে।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে বনহুর ও হরি ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে এসে উঠলো। ঢাকা শহরের প্রখ্যাত হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল। ম্যানেজার বনহুরের চেহারা দেখে তাকে মস্ত বড় একজন অফিসার মনে করলেন। এখানে সমাদরের কোনো অভাব ছিলো না, কাজেই বনহুরের অসুবিধা হলো না কিছু।

পরিচ্ছন্ন সুন্দর মর্ডাণ প্যাটার্ণের হোটেল, আগন্তুকদের রিসেপ্শন কারণে শিক্ষিত মার্জিত যুবকগণ সদা ব্যস্ত রয়েছেন। বয়-দারওয়ান—এ সবেরও অভাব নেই। সুন্দর সুসজ্জিত কামরাগুলো আগন্তুকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যার-যার নাম্বার অনুযায়ী কক্ষ উন্মোচন করে দেওয়া হচ্ছে।

বনহুর পৌঁছতেই রিসেপ্শনিষ্ট তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তার কামরায় নিয়ে গেলো।

কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর তৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো। ঢাকায় এসে এমন একটা সুন্দর হোটেল পাবে, ভাবতে পারেনি সে।

প্রথম দিনই বনহুর হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে ভালভাবে পরিচয় করে ভাব জমিয়ে নিলো। ম্যানেজার অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি। তিনি বনহুরের ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন। হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে বিদেশ থেকে কত লোকই আসেন, চলে যান, তেমন করে কারো সঙ্গে আলাপ করার সময় হয় না তাঁদের।

বনহুর গায়ে পড়ে ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করে নিলো। ম্যানেজারও প্রীতি বোধ করলেন বনহুরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে।

প্রথম দিন বনহুর ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে এলো একবার। অবশ্য হরিও ছিলো তার সঙ্গে। ম্যানেজারের সহায়তায় একখানা গাড়ি কিনে ফেললো সে, নতুন ওপেল কার।

বনহুর প্রথম দিনই ঢাকা শহরের ভাবধারা বুঝে নিলো। বড় বড় নামকরা রাজপথ ছাড়াও সে প্রতিটি অলিগলিও ঘুরেফিরে দেখে নিলো তার ওপেল কার নিয়ে। মস্তবড় অট্টালিকার পিছনে যে নিকৃষ্ট কুড়েঘর আছে সেগুলোও তার চোখে বাদ পড়লো না। বাদ পড়লো না পথের ধারে ধুকে মরা জীব নামের মানুষগুলো। হস্‌পিটালের সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় তার নজরে পড়লো, ফুটপাতের উপর পড়ে আছে একটি কঙ্কালসার অসুস্থ যুবক। গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিয়ে লক্ষ্য করলো বনহুর, লোকটার মাথার নিচে একটি ছেঁড়া কাঁথা জড়ানো, পাশেই পড়ে আছে একটা ধানকাটা কাঁচি আর ঘাস তোলার খুরপাই। বনহুর বুঝতে পারলো, লোকটা একজন মজুর। এই শস্যা-শ্যামলা পূর্ব পাকিস্তানেও মজুরের এ অবস্থা? এক মুঠি অন্নের জন্য সে তিলতিল করে ধুকে মরছে, হয়তো বা কাজের অন্বেষণে দ্বারে দ্বারে ফিরে কোনো কাজ পায়নি, কেউ দেখেনি, সে ক'দিন না খেয়ে আছে। ভিখারী নয় সে, তাই চেয়ে নেবার মত মনোবল ছিলো না। হয়তো চেয়েও ছিলো-ধমকে দিয়েছেন স্বনামধন্য বাবুর দল, বেটা খেটে খেতে পারিসনে। কেউ বা বলেছেন জোয়ান ছোকরা ভিক্ষা চাস, লজ্জা করে না? কিন্তু কেউ কি ভেবে দেখেছে কাজ সে সারাদিন খুঁজেও পায়নি।

হয়তো পথের ধারে কলের পানি পান করে ক্ষুধা নিবারণের চেস্টা করেছে, কিন্তু অগণিত কলসীর ভিড়ে সে পৌঁছতে পারেনি কলটার পাশে। হোটেলের পাশে ডাষ্টবিনে উচ্ছিষ্ট খাদ্যের অন্বেষণে হয়তো বা হাতড়ে ফিরেছে, কিন্তু অসংখ্য ক্ষুধার্ত কুকুরের জ্বালায় ভয়ে পালিয়ে এসেছে। একদিন নয়, দু'দিন নয় ক'দিন মানুষ উপোস করে কাটাতে পারে। ক্ষুধা নিবারণে অখাদ্য ভক্ষণ করেছে, যার জন্য সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিংবা ক্ষুধার জ্বালায় দিন দিন দুর্বল শক্তিহীন হয়ে মরণের পথে এগিয়ে গেছে। ভেবেছে হসপিটালে ভর্তি হয়ে জীবনে বেঁচে যাবে, কিন্তু চিরদুঃখী অসহায়ের জন্য হসপিটাল নয়। হসপিটালে সিটের অভাবে তাকে তাড়িয়ে

দেয়া হয়েছে। চলৎশক্তি রোহিত তখন সে, কাজেই কোথায় যাবে—ফুটপাতে পড়ে রয়েছে জ্ঞানশূন্য অবস্থায়। বন্ বন্ করে মাছি উড়ছে, কতগুলো মাছি প্রবেশ করছে লোকটার হা করা মুখ-গহ্বরে। বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিলো।

হরি কি যেন বললো কানে গেলো না বনহুরের, কারণ তখন সে তার মনের মধ্যে চিন্তার জাল বুনে চলেছে। সে ভেবেছিলো শস্যা-শ্যামলা বাংলাদেশের মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় ধুকে ধুকে মরে না কিন্তু সে ভুল তার ভেঙ্গে গেছে। প্রথম যেবার বনহুর বাংলাদেশের মাটি কলকাতায় পদার্পণ করেছিলো, দেখেছিলো ইট পাথরের ইমারতের পাশে এক ভয়ংঙ্কর পরিবেশের নির্মম পরিণতি। যেখানে মানুষ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। দেখেছিলো মানুষ হয়ে মানুষের বুকের রক্ত কেমন করে শুষে নেয়। দেখেছিলো মানুষনামী কতগুলো প্রাণী রাজভোগে ক্ষুধা নিবারণ করে, আর তাদের উচ্ছিষ্ট নিয়ে ডাষ্টবিনের পাশে কাড়াকাড়ি করে কতগুলো জীব।

বনহুর আজ ঢাকা শহরের বুকেও লক্ষ্য করে তারই প্রতিচ্ছবি।

এই বুঝি সোনার পূর্ব পাকিস্তান?

ওয়াইজঘাটে নদীর ধারে গাড়ি রেখে নেমে এলো বনহুর। হরি তার পিছনে, এগিয়ে চলেছে বনহুর সদরঘাটের দিকে। অসংখ্য জনতা ভিড় করে জিনিসপত্র বেচা-কেনা করছে। কেউ কারোদিকে তাকিয়ে দেখার অবসর নেই।

বনহুর প্রতিটি দোকানের দিকে লক্ষ্য করে, লক্ষ্য করে কেমনভাবে এরা বেচা-কেনা করছে। বনহুরের দীপ্ত সুন্দর চেহারা প্রায় জনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলো, দোকানিগণ উচ্চকণ্ঠে তাকে আহ্বান জানাচ্ছিলো—সাহেব, আসুন ভাল শাড়ী আছে। কোনো দোকানী বা তাকে দেখে এগিয়ে দিচ্ছিলো মূল্যবান প্যান্টের কাপড়—নিন সাহেব, আসল দামেই দেবো, লাভ রাখবো না এক পয়সা।

বনহুর মাথা নাড়লো—ওসব প্রয়োজন নেই।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখলো নানা রকম শাড়ী-জামা-ব্লাউজের দোকান। জুতোর দোকান, মনোহারী দোকান—এগিয়ে চললো বনহুর আরও ভিতরে, অনেকগুলো দর্জি সেলাই মেসিন চালিয়ে অনবরত কাজ করে চলেছে। বনহুরকে দেখে ক্ষণিকের জন্য তারা অবাক হয়ে তাকালো। বনহুর আরও ভিতরে প্রবেশ করলো, কতগুলো হোটেলের পিছনভাগ সেটা। কি ভয়ঙ্কর নোংরা, কর্দমযুক্ত জায়গা। এদিকটা এতো নোংরা প্রথমে ভাবতেই পারেনি বনহুর। একটা হোটেলের পিছনে কতগুলো উচ্ছিষ্ট হাড় নিয়ে কয়েকটা

নেংটা বালক কাড়াকাড়ি মারামারি করছে। মাছি উড়ছে বন বন করে। কুকুর গুলোও যোগ দিয়েছে বালকগুলোর সঙ্গে।

বনহুরকে দেখে এসব অঞ্চলবাসী নিকৃষ্ট মানুষগুলো অবাক হলো। এদিকে তো বড়লোক সাহেব বাবুরা বড় একটা আসেন না। তাই ওদের মনে এতো বিস্ময়।

হরি বললো—বাবু, দুর্গন্ধে আমার পেটের নাড়ীভুড়ি বেরিয়ে আসছে।

বনহুরের অবস্থাও তাই, কিন্তু সে দেখতে চায়—ঢাকা শহরের চাকচিক্যময়ের পিছনে অন্ধকারের রূপ কেমন।

এদিকে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।

বনহুর বেরিয়ে আসে সদরঘাটের ভিতর অংশ থেকে।

সরু নোংরা গলির মধ্যদিয়ে বনহুর যখন ঘাটের দিকে এগুচ্ছিলো তখন হঠাৎ নজরে পড়লো দু'জন লোক একটি বালককে হাত ধরে দ্রুত নিয়ে চলেছে। বনহুর থমকে দাঁড়ালো। লোক দুটো ঠিক তার পাশ কেটেই চলে যাচ্ছে সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকারে। ওদিকে থেমে থাকা একটা মালবাহী ষ্টীমারের সিড়ি বেয়ে উঠে গেলো লোক দুটো বালকটিকে নিয়ে।

বনহুরের মনে সন্দেহ জাগলো, নিশ্চয়ই ওরা ভাল মানুষ নয়। কোনো ভদ্রলোকের সন্তান ওরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলে ধরা, ঠিক্ ছেলে ধরাই হবে।

প্রতিদিন রেডিও ঘোষণায় শোনা যায় অসংখ্য ছেলে হারানো সংবাদ।

বনহুর মুহূর্ত ভেবে নেয়, এক্ষুণি ছেলেটিকে বাঁচিয়ে নিতে হবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, যদি ওরা ছেলে ধরা না হয় তাহলে অপদস্ত হবে। আচ্ছা, ওরা যদি সৎ ব্যক্তিই হবে তাহঁলে অমন করে চোরের মত পালাবে কেন, বনহুর ইচ্ছা করলেই ছেলেটিকে উদ্ধার করে নিতে পারে কিন্তু তা করলো না, সে চায় দেখতে সত্যিই ওরা ছেলে ধরা কিনা এবং এক জনকে নয়, ওদের সমস্ত দলকে ধরতে। হয়তো বা ওদের কবলে আছে এমনি আরও অনেক ছেলেমেয়ে।

বনহুর হরিকে গাড়ির চাবি দিয়ে বললো—হরি, আমি ওদের ফলো করবো, নিশ্চয়ই ওরা ছেলে ধরা।

আর আমি?

তুই গাড়ি খুলে ওর মধ্যে বসে থাকবি।

বাবু, একা একা আমি থাকবো---

আমি ওদের সন্ধান নিয়ে এক্ষুণি ফিরে আসছি, ষ্টীমারখানা ছাড়তে বিলম্ব আছে কিনা দেখে আসবো শুধু।

আচ্ছা বাবু। হরি বনহুরের হাত থেকে চাবি নিয়ে এগিয়ে যায় গাড়ির দিকে। কেমন যেন একটা আশঙ্কায় কেঁপে উঠে হরির বুক।

বনহুর ততক্ষণে এগিয়ে যায় ওদিকে অন্ধকারে থেমে থাকা ষ্টীমারখানার দিকে। একটু পরে ফিরে আসে বনহুর—হরি, ষ্টীমারখানা ছাড়তে বিলম্ব হবে বলে মনে হলো। আমি ততক্ষণে তোকে হোটেলে পৌছে দিয়ে ফিরে আসতে পারবো।

হরি চট্, করে কোনো জবাব দিতে পারলো না। আর কিই বা জবাব দেবে বোবা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো।

বনহুর দ্রুত ড্রাইভিং আসনে চেপে বসলো। তারপর গাড়ির মুখ বুলবুল একাডেমীর রাস্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পাটুয়াটুলী রোড হয়ে লিয়াকত এভিনিউ ধরে ছুটতে শুরু করলো।

এতো ভিড়ের মধ্যে স্পীডে গাড়ি ছুটে চলেছে, বার বার সে তাকাচ্ছে তার হাতের রেডিয়াম হাতঘড়িটার দিকে। অন্ধকারে বনহুরের কাজ—এ ঘড়িটা তাকে সর্বক্ষণ সাহায্য করে থাকে।

অল্পক্ষণেই বনহুর হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে পৌছে গেলো। গাড়ি রেখে বনহুর প্রবেশ করলো ভিতরে, হরি তাকে অনুসরণ করলো। হরিকে রেখে বনহুর যখন ফিরে এলো পুনরায় সদরঘাটে তখন বনহুরকে চিনবার জো নেই। তাকে দেখলে একজন খালাসী বা কুলি ছাড়া কিছু মনে হবে না।

বনহুর নদীর তীরে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো ষ্টীমারখানা সবে ঘাট ত্যাগ করে মাঝনদীর দিকে এগুচ্ছে। আর একটু আগে এলেই তার কাজ সমাধা হতো। এখন কি করা যায়—বনহুর মুহূর্ত ভেবে নিয়ে নেমে পড়লো নদীর পানিতে। যেমন করে হোক ষ্টীমারখানাতে তাকে উঠতেই হবে। ছেলে ধরার দলকে শাস্তি না দিয়ে সে কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারবে না। কত অসহায় শিশুকে ওরা এভাবে রোজ নিখোঁজ করে দিচ্ছে।

এখানের পানিগুলো নির্মল সচ্ছ নয়, ষ্টীমার আর অগণিত নৌকা চলাচলে ঘাটের পানি তৈলাক্ত হয়ে উঠেছে। বনহুর সাঁতার কেটে দ্রুত এগিয়ে চললো, সম্মুখে ষ্টীমারখানা তখনও স্পীডে চলতে শুরু করে।

বনহুর ধরে ফেললো ষ্টীমারের পিছন অংশটা, কাটা তক্তা বেয়ে উঠে পড়লো উপরে। ভাগ্যিস পিছন দিকে কেউ ছিলো না, তাই তাকে কেউ দেখতে পেলোনা। ষ্টীমারের মধ্যে শুধু স্তুপাকার নারিকেল। বনহুর বুঝতে পারলো, নারিকেলের ব্যবসার নাম করে এরা ছেলে চুরির ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। নারিকেলের স্তুপের আড়ালে আত্মগোপন করে রইলো বনহুর, ভিজে

চুপসে গেছে তার জামা-কাপড়, সেদিকে তার খেয়াল নেই। লক্ষ্য করছে সে ষ্টীমারের লোকজনের কার্যকলাপ।

সন্ধ্যার অন্ধকার এখন জমাট বেঁধে উঠেছে। ষ্টীমারের উপরে শুধু নারিকেলের স্তুপ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছে না। বনহুর অত্যন্ত সন্তর্পণে আর একটু এগিয়ে গেলো, দেখলো কয়েকটা লোক বসে খোস গল্প জুড়ে দিয়েছে।

প্রত্যেকের চেহারা কদাকার ঠিক শয়তানের মত দেখতে। বিড়ি খাচ্ছিলো আর আলাপ—আলোচনা করছিলো। লোকগুলোর কথাবার্তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো না, ষ্টীমারের শব্দে অস্পষ্ট কানে আসছিলো; কে যেন বলছে—মাল পৌছে দিয়েই আমরা ফিরে আসবো তো হুজুর?

অন্য একটি গলা—বাদলা আর হাবলু মাল নিয়ে চলে যাবি, ঘাটিতে মাল পৌছে দিয়ে আসবি তোরা। আমরা তোদের নামিয়ে দিয়েই আবার ঢাকায় ফিরে আসবো।

হুজুর টাকা?

টাকা অগ্রিম নিয়ে নিয়েছি, কিছু বাকী আছে—মাল হাতে হাতে পেলেই তোদের কাছে ওরা টাকাটা দিয়ে দেবে।

এমন সময় একটা লোক অন্য কামরা থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়—হুজুর, ওকে কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না।

মোটা লোকটা বলে উঠলো—গোটা কয়েক চাপড় লাগিয়ে দেগে, চুপ হয়ে যাবে।

গয়া কটা চাপড় দিয়েছিলো হুজুর কিন্তু আরও বেশি করে কাঁদছে।

আর একটি গলা শোনা গেলো—গলা টিপে শেষ করে দে ওটাকে।

পূর্বের গলা—একটা মাল নষ্ট করলে অনেক ক্ষতি হবে যে হুজুর।

তা হলে আমার কাছে প্যান প্যান করতে এসেছিস কেন বেটা? ভাগ্ যে করে হোক থামিয়ে নে গে।

এতক্ষণ মনোযোগ সহকারে লোকগুলোর আলাপ—আলোচনা শোনার চেষ্টা করছিলো বনহুর, এবার ষ্টীমারের ঝক্ ঝক্ শব্দ এড়িয়ে কানে আসে কোনো বালক বা বালিকার কান্নার সুর। ক্ষীণ করুণ আওয়াজ।

বনহুরের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠে, ক্রুদ্ধভাবে অধর দংশন করে সে। হঠাৎ সদরঘাটের অলিগলি সন্ধান করতে গিয়ে খোঁজ পেয়ে গেলো শয়তান দলের। ভাগ্যিস বনহুর আজ ঠিক সময় এসে পড়েছিলো তাই নজরে পড়ে গেছে, নাহলে ছেলেটাকে নিয়ে কোথায় চলে যেতো ওরা ওক জানে।

ভালভাবে কান পাতলো বনহুর, আবার শোনা যায় একটি কণ্ঠ—ছেলেটাকে কোথায় পেলি হাবলু?

দ্বিতীয় কণ্ঠ—স্কুল থেকে বাড়ি যাচ্ছিলো, হাতে বই-পুস্তক ছিলো।

তা কেমন করে হাতে পেলি? অন্য আর একটি গলার আওয়াজ এটা।

দ্বিতীয় গলার স্বর—ছেলেটা এগিয়ে যাচ্ছে, চেয়ে দেখলাম তার সঙ্গীরা এগিয়ে গেছে অনেক দূর। আমি ডাকলাম খোকা, ও খোকা---ছেলেটা ফিরে তাকালো আমার দিকে। আমি বললাম—আমাকে চিনতে পারছো না? খোকা আমার দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, বললো—না তো! কে তুমি? আমি তখন আরও সরে এলাম ছেলেটার দিকে, কাঁধে হাত রেখে বললাম, আমি তোমাদের সেই পুরানো চাকর। আমাকে চিনতে পারছো না? তা চিনবে কেমন করে, তুমি তখন খুব ছোট্ট ছিলে কিনা?

তৃতীয় কণ্ঠ—বাঃ চমৎকার বুদ্ধির প্যাচ জানিস্ তুই।

প্রথম কণ্ঠ—তাই তো ওকে আমি এতো খাতির করি, বুঝলি?

দ্বিতীয় কণ্ঠ—আজকাল বুদ্ধি না থাকলে চলবে কেন? দেখিস্ তো আমি মাসে একটা দুটো, কোনো মাসে তিনটে পর্যন্ত জোগাড় করি। আর তোরা দু'তিন মাসে একটা।

হাঁ, ঠিক বলেছে হাবলু, ওর মত কেউ জোগাড় করতে পারে না। ব্যবসা তো চলছে ওর জন্যই। গলার স্বরটা প্রথম ব্যক্তির বলে মনে হলো।

বনহুরের চোখ দুটো দিয়ে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছে। দক্ষিণ হস্ত মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে আসছে বার বার। এই মুহূর্তে লোকগুলোর টুটি ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। কিন্তু বনহুর এতো সহজে ওদের ধ্বংস করতে চায় না, সমস্ত উদ্ঘাটন করে সমূলে বিনষ্ট করবে। ধৈর্য সহকারে শোনে সে। শোনা যায় তখন হাবলুর গলা—ছেলেটা আমার কথা শুনে বললো, তোমার নাম রাজু বুঝি? হেসে বললাম—ঠিক বলেছো। এবার তাহলে চিনতে পেরেছো তোমার রাজুকে? সব সময় তুমি আমার কোলে থাকতে; আম্মার কাছেও যেতে চাইতে না। চলো আম্মার সঙ্গে দেখা করে আসি---কথাটা শুনে খুশি হয়ে উঠলো, বললো—চলো না রাজু। আমি তখন পকেট থেকে চকলেটের প্যাকেটটা বের করে ওর হাতে দিলাম—খাও। প্রথমে কিছুতেই হাতে নিতে চাইছিলো না, অনেক করে বুঝালাম, নাও আমি তোমাদের রাজু সখ করে তোমার জন্য চকলেট এনেছি।

তারপর কি করলো খোকা?

আমি ওর হাতখানা ধরে গুড়ে দিলাম চকলেটের প্যাকেটটা ওর হাতের মধ্যে, বললাম—খাও খোকা, খুব ভাল চকলেট। চকলেটের লোভ সামলানো ছোট্ট খোকার পক্ষে সম্ভব হলো না, সে টুপ করে একটা মুখে ফেললো।

বাঃ বাঃ তারপর?

পর পর আমি আরও দুটো কাগজ ছাড়িয়ে ওর মুখে তুলে দিলাম—খাও খোকা, আরও খাও। খোকা চিবিয়ে খেতে শুরু করলো। আমার তখন আর তর সইছে না, হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে তাহলে সব যাবে মাটি হয়ে। গলিটা ছিলো নীরব তাই না রক্ষে--

আর একজনের গলা—আমি ঐ রুনু ছেলেটাকে কেমন করে হাত করে ছিলাম শুনলে অবাক হবি।

থাম্, হাবলু আজ কেমন করে বাবলুকে এনেছে তাই আগে শুনতে দে। পরে তোর কথা শুনবো।

হাত ধরে বললাম চলো খোকা, তোমার আম্মার সঙ্গে দেখা করে আসি। খোকা তখন ঝিমুচ্ছে, কারণ চকলেটের ঔষধের গুণ ধরে গেছে তার দেহে। খোকা নীরবে অনুসরণ করলো আমাকে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি খোকা? বললো ও—বাবলু। ততক্ষণে খোকাসহ আমি এসে পড়েছি—তখন বাদলার সঙ্গে দেখা। আমরা দু'জন ওকে দোকানগুলোর পিছন দিক্ করে ষ্টীমারে এসে হাজির হলাম।

বনহুর বুঝতে পারলো সন্ধ্যায় যে ছেলেটিকে এরা ধরে নিয়ে এলো, এ ছেলেটিকে নিয়েই ওদের আলোচনা চলছে।

কি ব্যাপার নিয়ে হাসলো ওরা বিদঘুটে হো হো হাসি।

ষ্টীমারের ঝক্ ঝক্ শব্দের সঙ্গে এ হাসির শব্দগুলো যেন আষাঢ়ে মেঘের গুড়গুড়ে আওয়াজের মত শোনালো। ভেসে এলো আর একটি গলার স্বর—বল্‌রে ভোলা, রুনুকে কেমন করে পেলি?

সে এক তামাসা, আমি আরও সহজে পেয়েছি।

বল না শুনি।

পরশু সন্ধ্যাবেলা নিউ মার্কেটে ঘুরছি, ভাবছি এ মাসটা আমার মিস গেলো। কয়েকটা পকেট মেরে পেয়েছিলাম শ'দুই টাকা—তা তো মালিকের গাঁজার দাম হয়নি, আমাকে দিয়েছিলো মোটে পচাত্তর টাকা। ক'দিন সিনেমা দেখেছি আর ক'বোতল দেশী মদ খেয়েছি, তাছাড়া ভেদীর মাকে এক পয়সা এ মাসে দেইনি।

যাক, তোর সংসারের কথা শুনতে চাইছি না বল্ না রুনুকে পেলি কোথায় বেটা? মেয়েটা খাসা কিন্তু বড় হলে মেলা দাম হবে। মালিক তোকে কত দেবে—শ'দুই কিংবা তিন তার বেশি নয়।

প্রথম ব্যক্তির গলা-রুনুকে আমার কাছে বেচে দে, আমি তোকে সাড়ে তিন'শ দেবো।

সাড়ে তিন'শ কেন চারশ তেও দেবো না, খাসা মাল।

যাক, বল ওকে কেমন করে পেলি?

হাঁ শোন তবে, নিউ মার্কেটে খুব ভিড়—ক'দিন পর ঈদ কিনা। ছেলেমেয়ে নিয়ে সবাই এসেছে—কেউ জামা কিনছে, কেউ জুতো কিনছে, কেউ শাড়ী নিয়ে ব্যস্ত। কোনো কোনো মহিলা গহনার দোকানে কি রকম মালা ঈদের জন্য নেবে পছন্দ করে দেখছেন, ছেলেমেয়ের দিকে লক্ষ্য নেবার সময় নেই তাদের। সঙ্গে বয় আছে বাচ্চাদের সামলাচ্ছে। আরে ভাই, চাকর-বাকরদের কতই বা দায়িত্ব। মা-বাবা যখন জিনিসপত্র কেনা নিয়ে মাতোয়ারা তখন বয় বেটা মার্কেটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দোকানের মন ভুলানো ঝকঝকে চাকচিক্যময় রং চং দেখছে, আর দেখছে টেডি মেয়েগুলো কেমন করে হাঁটছে। রুণুকে নিয়ে একটা বড় দাঁড়িয়েছিলো বারান্দায় ওর মা বাবা তখন শাড়ী কেনা নিয়ে ব্যস্ত। বয় বেটা হা করে তাকিয়ে আছে দুটো টেডি পোশাক পরা মেয়ে তখন চলে যাচ্ছিলো তার সম্মুখ দিয়ে সেদিকে। রুণু তখন একটা খেলনা গাড়ি দেখে সরে এসেছে বয়টার কাছ থেকে কিছুটা দূরে। বাস্, আমি আনেকক্ষণ থেকে মেয়েটাকে লক্ষ্য করছিলাম —পেয়ে গেলাম সুযোগ। পাশের দোকান থেকে চট করে একটা পুতুল কিনে নিয়ে রুণুর সামনে ধরলাম—চোখ কিন্তু আমার রুণুর বাবা-মা আর বয়টার দিকে। বাবা-মা তখন শাড়ীখানা মানাবে কিনা এই নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। বয় বেটা তো তখনও টেডি গার্ল দুটির যৌবন ঢল ঢল রূপসুধা পান করে চলেছে---

অন্য একজন বলে উঠলো—খুবতো বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছিস, ইংলিশ বলতে শিখেছিস দেখছি। আসল কথা বল তারপর কি করলি?

ষ্টীমারের শব্দে কান ঝালাপালা হলেও বনহুর তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য রেখে ওদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলো। আশ্চর্য হচ্ছিলো সে মনে মনে। ছেলেধরাদের ছেলে ধরার কৌশলাদির শলা পরামর্শ তাকে বিস্ময়াহত করে তুলছিলো।

বল্ বেটা, তারপর কি করলি? এটা প্রথম ব্যক্তির কণ্ঠস্বর বলে মনে হলো।

আবার লোকটা বলতে আরম্ভ করলো—আমি মেয়েটার সামনে পুতুল ধরতেই সে খুশি হয়ে হাত বাড়ালো, আমি তখন চট করে তুলে নিলাম কোলে, পুতুলটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হলাম। দেখলি তো কেমন সহজে কাজ হাসিল করলাম? বাবা-মা-চাকর—সবার চোখেই ধূলো দিয়ে দিব্য নিয়ে এলাম রুণুকে।

ওরা নাম যে রুণু জানলি কি করে? অন্য একজন বললো।

বাঃ এই সামান্য কথাটা জানবো না। রুণুকে চুরি করার কয়েক ঘন্টা আগে থেকে ওকে লক্ষ্য করছি। দূরে ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে

দেখছিলাম, বয়টার কোলে যখন মেয়েটা ছিলো তখন ওর বাবা মাঝে মাঝে 'রুণু, রুণু' বলে ডাকছিলো। তা' ছাড়া মেয়েটি তো ওর নাম বলতে পারে।

খুব একটা দাও মেরেছিস্ বেটা, মোটা টাকা মারবি।

আরে ভাগ্য মন্দ নইলে এবার শুধু একটা; এর আগেরবার দু'টো ছেলে আর একটা মেয়ে-তিন তিনটে মাল জোগাড় করেছিলাম।

বনহুরের দস্যুপ্রাণও শিউরে উঠলো, কি সর্বনাশা কথা শুনছে সে। পূর্ব পাকিস্তানেও এ রকম ছেলে-মেয়ে চুরির হিড়িক আছে। সে ভেবেছিলো শস্য শ্যামলা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষগুলোও বোধ হয় সুন্দর স্বচ্ছ সরল আর স্বাভাবিক, নেই তাদের মধ্যে কোনো দুষিত কূটপ্রাণ। কিন্তু একদিনেই বনহুর যা দেখলো আর জানলো তাতেই তার মন বিষিয়ে উঠেছে। পূর্ব পাকিস্তানের শ্যামল স্বচ্ছ রূপের পিছনেও যে আছে একটা কঠিন কালো রূপ তা প্রকাশ পেয়েছে বনহুরের কাছে।

বনহুর নারকেলের স্তুপের আড়ালে আত্মগোপন করে এগিয়ে গেলো ওদিকে। একটা ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করলো সে নিচের ক্যাবিনটা। বিস্মিত হলো বনহুর—তিনটা ছোট ছোট শিশুকে ক্যাবিনটার মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে। একটি মেয়ে আর দু'টি বালক। একটি বালক চোখ রগড়াচ্ছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর দু'টি বালক-বালিকা অবাক হয়ে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। তাদেরও মুখ শুকনো, চোখ দুটো লাল, বোধ হয় অনেক কেঁদেছে। মায়া হলো বনহুরের, আহা বেচারী না জানি কাদের সন্তান। হয়তো তারা সন্তানদের হারিয়ে পাগল হয়ে পড়েছেন। বনহুর দেখবে এদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কোথায় এদের আস্তানা?

বনহুর এক সময় বুঝতে পারলো, ষ্টীমারখানা নারকেল বোঝাই হয়ে খুলনা অভিমুখে চলেছে।

❑

গভীর রাতে ষ্টীমারখানা কোনো এক বন্দরে নোঙর করলো। বনহুর একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলো, তন্দ্রা এসেছিলো তার চোখে। ষ্টীমার থেমে পড়ায় জেগে উঠলো, সজাগ হয়ে তাকালো সে।

বনহুর লক্ষ্য করলো, ষ্টীমারে কয়েকজন লোক উঠে এলো অন্ধকারে, বেশ মোটা মোটা বলিষ্ঠ চেহারার লোকগুলো, তাড়াতাড়ি ক্যাবিনের জানালা দিয়ে ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

ষ্টীমারের লোকগুলোর সঙ্গে আরও কয়েকজন এসে দাঁড়িয়েছে সেই ক্যাবিনটার মধ্যে। এখন বালক দু'টি আর বালিকাটি ঘুমোচ্ছে।

লোকগুলো কিছু বলাবলি করে নিলো, তারপর তিনজন বলিষ্ঠ লোক তিনটি শিশুকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিলো কাঁধে।

বনহুর বিলম্ব না করে ষ্টীমারের পিছন অংশ দিয়ে একটা দড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে, অতি সাবধানে ঘাটে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলো, তিনটি শিশুকে নিয়ে লোকগুলো ষ্টীমার থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে।

আশে পাশে কোনো লোকজন নেই, ছোট্ট বন্দর।

কোন্ বন্দর এটা অন্ধকারে ঠিক বুঝা গেলো না। বন্দরের খালাসী আর কুলি-মজুর সবাই এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। অন্ধকারের আড়ালে কত বড় সর্বনাশ ঘটে যাচ্ছে কে তার হিসেব রাখে!

লোকগুলো ফিস ফিস করে কথাবার্তা বলছে, কি সব আলোচনা করে নিলো ঠিক সব শুনতে না পেলেও বনহুরের কানে এলো দু'চারটে চাপা শব্দ—মালিক বলেছে মাল পৌঁছে দিয়ে দাম নিতে।

বাকী হবে না কিন্তু---

না না, সব কথা পাকা হয়েছে---

চল্ তবে বেটা---

বাদলা, হুশিয়ার মত যাবি----

সে কথা আর বলতে হবে না----

একটা সিগারেট ধরা হাবলু---

ম্যাচ জ্বাললে লোকে দেখে ফেলতে পারে---

এগিয়ে চল্---

হাঁ, সরে গিয়ে বিড়ি-সিগারেট যা খুশি খাবি--

অন্ধকারে ছায়ার মত এগিয়ে চললো ওরা।

বনহুর অনুসরণ করলো দূর থেকে।

গাঢ় অন্ধকারে লোকগুলো তর তর করে এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে শিশুগুলোকে কাঁধ পাল্টে নিচ্ছে ওরা। জায়গাটা ঠিক কোথায় বুঝা না গেলেও বনহুর বুঝতে পারলো, ঠিক শহর নয়—একটা সাধারণ বন্দর বা হাটুরে মত স্থান এটা।

বেশ কিছু জমি-জায়গা পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে একটা পোড়ো বাড়ির মত জায়গায় এসে থামলো ওরা। বনহুর তখন তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে একটা গাছের গুড়ির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে চুপ করে দেখতে লাগলো।

লোকগুলো পোড়ো বাড়িটার ভিতরে প্রবেশ করলো।

বনহুর কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলো গাছটার আড়াল থেকে। দ্রুত পোড়ো বাড়িটার দিকে এগুলো। সদর গেট বন্ধ, বাড়িটার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভেবে

নিলো বনহুর কি করবে এখন। অন্ধকার হলেও বাড়িটার রূপ কিছু কিছু অনুমান করে নিলো, ভাঙাচুরো ইট খসে-পড়া বাড়িটা। বাইরে থেকে কোনো গরীব বেচারীর বাড়ি বলেই মনে হয়। বনহুর ওদিকের প্রাচীর টপকে প্রবেশ করলো ভিতরে। বাঃ চমৎকার, ভিতরে একেবারে রাজ বাড়ির মত শাহানশাহী ব্যাপার।

বাড়িখানা কোনো কালের পুরোনো জমিদার বাড়ি ছিলো বলে মনে হয়। কয়েক পা এগুতেই বনহুর শুনতে পেলো হেঁড়ে গলা—তিন সপ্তাহে মাত্র তিনটি মাল এনেছিস বেটারা? দিন দিন দেখছি তোরা সব অকেজো হয়ে পড়ছিস।

বনহুর তার পিছনে পদশব্দ শুনতে পেয়ে তড়িৎ গতিতে সরে দাঁড়ালো একটা দেয়ালের আড়ালে। একটা লোক চলে গেলো বনহুরের সম্মুখ দিয়ে। লোকটা সামনের ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করলো।

কান পাতলো বনহুর, লোকটার চলা দেখেই সে বুঝতে পেরেছিলো, কোনো দরকারী সংবাদ নিয়েই লোকটা দ্রুত যাচ্ছে, নিশ্চয়ই কোন জরুরী খবর নিয়ে এসেছে। শুনতে পেলো বনহুর সেই হেঁড়ে গলার স্বর—কিরে, ফিরে এলি যে?

মালিক, গাড়ি এসে গেছে, মাল নিয়ে আমাকেই যেতে হবে।

গাড়ি এসে গেছে?

হাঁ মালিক।

তুই থেকে যা খালেক, আমি গফুরকে পাঠাচ্ছি।

গফুর নতুন মানুষ, তাছাড়া মহাজন তাকে চেনে না।

আমি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি, তাতে সব লেখা থাকবে। গাড়ি তো সে-ই পাঠিয়েছে, কাজেই পথ চিনে যেতে হবে না। গফুর শুধু মাল পৌঁছে দিয়ে টাকা নিয়ে চলে আসবে।

আচ্ছা মালিক।

যাও, গফুরকে এক্ষুণি পাঠিয়ে দাও। এই নাও চিঠি, এটা ওকে দিও।

আচ্ছা।

লোকটা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো।

বনহুরের কানে এলো—বাদলা, মাল তিনটা গাড়িতে উঠিয়ে দে। গফুর যাবে সঙ্গে।

বনহুর বিলম্ব না করে অন্ধকারে যে লোকটা গফুরকে চিঠি দেওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলো তাকে অনুসরণ করলো। কয়েকটা ঘর পেরিয়ে একটা বড় ঘরে এসে ঢুকলো।

মেঝেতে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলো একটা লোক।

যে লোকটা কক্ষে প্রবেশ করলো সে ঘুমন্ত লোকটার দেহে পা দিয়ে আঘাত করলো—গফুর—গফুর—জলদি ওঠ্।

ধড়ফড় চোখ রগড়ে উঠে বসলো গফুর-এ্যাঁ, কি বলছো দাদা?

এই চিঠি নিয়ে মালের সঙ্গে যাবি, গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

চিঠি হাতে নিয়ে বলে গফুর—আমি কিছু চিনি নাকি, না বুঝি কিছু?

তোকে কিছু বলতে হবে না, বুঝতেও হবে না; চিঠি নিয়ে গাড়িতে উঠে বসবি চোখ বন্ধ করে, পৌছে যাবি আসল জায়গায়। ঠিক জায়গায় গাড়ি তোকে পৌছে দেবে, মাল নামিয়ে দিয়ে চিঠি হাতে দিবি, কিছু বলতে হবে না—বাস্।

কথাগুলো বলে বেরিয়ে গেলো লোকটা।

চিঠি হাতে গফুর ঝিমুতে ঝিমুতে উঠে দাঁড়ালো।

এমন সময় বনহুর কক্ষে প্রবেশ করে টিপে ধরলো তার গলা, একটু টু শব্দ করতে দিলো না, গলায় চাপ দিয়ে শেষ করে ফেললো ওকে। লোকটাকে হত্যা করতে বাধ্য হলো বনহুর, কারণ ছেলেধরার দলকে পাকড়াও করতে হলে এবং শত শত ছেলেকে রক্ষা করতে হলে এমন অনেক হত্যাই তাকে করতে হবে। লোকটার নিস্পন্দ দেহটা পাশের চৌকির নিচে ঠেলে লুকিয়ে রেখে চিঠিখানা পকেটে রাখলো তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে। দেখতে পেলো, একটা নারকেল বোঝাই গরুর গাড়ি অপেক্ষা করছে।

বনহুর এগিয়ে আসতেই গাড়োয়ান বললো—চট্ করে উঠে পড়, দেখছিস্ না ভোর হয়ে এলো?

বনহুর কোনো কথা না বলে গাড়িতে উঠে বসলো। পিছনে এবং সামনে বোঝাই নারিকেলের স্তুপ। ভাবলো মাল তবে কি নারিকেল না ঐ শিশুগুলো। গাড়োয়ান গাড়ি ছাড়লো। দু'জন লোক দাঁড়িয়ে ছিলো গাড়িখানার পাশে, একজন বললো —সাবধানে নিয়ে যাস্ গফুর। গাড়ির ভিতরে মাল রইলো।

বনহুর এতক্ষণে অনুভব করলো, শুধু নারকেল বোঝাই গাড়িখানাই নয়, এর ভিতরে আছে আসল মাল ছেলে-মেয়েগুলো। গাড়োয়ান বললো—কিরে গফুর, ঝিমুচ্ছিস্ নাকি?

না তো!

তবে অমন চুপচাপ রয়েছিস কেন? নে সিগারেট বের কর। এবার হাসলো—নতুন নতুন যে আসে সে এমনই হয়। তোর নাম তো বাদলার কাছে জেনে নিলাম, আমার নামটা তোকে বলে রাখি, না হলে ডাকবি কি করে—আমার নাম গয়া দত্ত।

বনহুর বললো এবার —খুব ভাল, আমার নাম গফুর আর তোমার নাম গয়া—খাসা। দু'জনারই নামের প্রথম অক্ষর গ দিয়ে —বেশ কিন্তু।

বাঃ চমৎকার, এমনি করে কথা বলতে হয়, না হলে এতোটা পথ মুখ বুঁজে যাওয়া যায়? আচ্ছা, তোকে আমি গফুরা করে ডাকবো?

হাঁ, গফরাই ভাল, ঐ নামেই ডেকো। আমার বাবা আমাকে সখ করে গফ্‌রা বলতো।

বেশ বেশ। তুই গান জানিস্ গফ্‌রা?

গান? তা জানি একটু আধটু।

গা না একখানা ভাল দেখে।

সর্বনাশ, গান গাইতে গিয়ে ধরা পড়ি আর কি? কথাটা বলে জবাবের প্রতীক্ষায় রইলো বনহুর।

গয়া হেসে বললো—কোন্ বেটা ধরবে আমাদের? সবাই জানে, আমরা নারিকেলের ব্যবসা করি। রোজ কত মাল আসে যায়, আজ পর্যন্ত কোনো বেটা সন্দেহ করেছে, না করতে পেরেছে।

ভাই, আমি নতুন কিনা তাই বড্ড ভয় করছে।

ভয় কি রে দু'দিন আমাদের সঙ্গে কাজ করলেই সব ভয় দূর হয়ে যাবে।

কোথায় যেতে হবে এখন আমাদের?

ভেড়ামারা গ্রাম, ওখানে আমাদের ঘাটি।

সে আরও কতদূর ভাই?

বেলা দশটা বাজবে।

বনহুর আশ্বস্ত হলো, ভাগ্যিস গফুর নতুন লোক ছিলো তাই রক্ষে, না হলে সব যেতো গুলিয়ে। কাজটা যত সহজ হচ্ছে এতোটা সহজ হতো না এ কথা সত্য। বনহুর বুঝতে পারলো, শিশুগুলোকে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে। নারিকেলের স্তুপের আড়ালে ঘুমিয়ে আছে তারা। মাঝখানে ছই বা চালা, দু'পাশে নারিকেলের স্তুপ।

বনহুর যখন ভাবছে তখন গয়া গলা ছেড়ে গান জুড়ে দিয়েছে।

ঘাটিতে পৌঁছতে দশটা বেজে এগারোটা পেরিয়ে বারোটা বাজলো।

পৌঁছে যেতেই টিনের বড় ফটক খুলে গাড়িটা ঘেরাও জায়গার ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো। বনহুর অবাক হলো, জায়গাটা বহুদূর নিয়ে ঘেরাও করা, মস্তবড় একটা টিনের ফাটক, যার মধ্যে অনায়াসে গাড়ি প্রবেশ করতে পারে। ঘেরাও করা জায়গাটার উঠানে শুধু নারকেলের স্তূপ আর স্তূপ।

হাসি পেলো বনহুরের, কি সুন্দর ছেলেচুরির ব্যবসা এরা নারকেল ব্যবসার মাধ্যমে চালিয়ে যাচ্ছে।

গাড়িখানাকে ঘেরাও জায়গার মধ্যে নিয়ে আসার পর কয়েকজন মানুষ এসে দ্রুত নারিকেল নামাতে শুরু করলো।

আর দু-তিনজন লোকা নামিয়ে নিলো সংজ্ঞাহীন তিনটি শিশুর দেহ।

বনহুর আর শিশু তিনটিসহ লোকগুলো প্রবেশ করলো গুদামঘরের মধ্যে। কি ভয়ঙ্কর স্থান সেই গুদামঘর, চারদিকে নারিকেলের পাহাড়, তারই মাঝখানে একটা চেয়ারে বসে আছে যমদূতের মত একটা ভীষণ চেহারার মানুষ।

বনহুর আর শিশু তিনটিসহ লোকগুলো এসে সেই ভীষণ চেহারার লোকটার সম্মুখে দাঁড়ালো।

গাড়োয়ান গয়া দত্তও ছিলো তাদের সঙ্গে, সে-ই প্রথম কথা বললো—মালিক, এই তিনটা মাল এসেছে।

মালের সঙ্গে কে এসেছে?

বনহুর তাড়াতাড়ি চিঠিখানা লোকটার হাতে দিয়ে সালাম করলো।

লোকটা চিঠিখানা পড়ে নিয়ে বললো—তোর নামই গফুর আলী।

হাঁ মালিক।

গাড়োয়ানকে মালিক বলতে শুনেছিলো তাই লোকটাকে মালিক বলে সম্বোধন করলো।

লোকটা পুনরায় চিঠিখানা পড়ে নিয়ে বললো—মাল তো পৌঁছালো কিন্তু এতো কম হলে চলবে কি করে? এ মাসে চালান যাবে কমপক্ষে বারোটা কিন্তু মোটে নয়টা জোগাড় হয়েছে। উঠো দাঁড়ালো লোকটা, এগিয়ে চললো সামনের দিকে নারকেল স্তূপের পিছনে।

শিশু তিনটিসহ তিন ব্যক্তি এগুলো তার পিছনে।

বনহুরও অনুসরণ করলো।

এখানে কেউ তাকে চেনে না, কাজেই বনহুরকে রীতিমত দাড়ি -গোফ পরতে হয়নি। একটু ধুলো-কালির ছাপ ছাড়া তার চেহারা স্বাভাবিক রয়েছে। শুধু ড্রেস পরিবর্তন করেছে সে, ছেঁড়া রং জ্বলে যাওয়া ব্লু ফুলপ্যান্ট, গায়েও তেমনি একটা ধূসর রঙ-এর ছেঁড়া তালিযুক্ত জামা, মাথায় ময়লা একটা গামছা জড়ানো।

নারিকেলের স্তূপের পিছনে এসে হতবাক হলো বনহুর।

অনেকগুলো ছেলেমেয়েকে সেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে—ছয়-সাত-দশ-বারো বছরের বালক-বালিকা আছে সেখানে। সবাই তখন বসে ছিলো, সকালের নাস্তা খেতে দেওয়া হয়েছে তাদের। শুকনো রুটী আর গুড় খাচ্ছে ওরা। সকলেরই মুখ মলিন বিষন্ন করুণ। ক্ষুধায় কাতর তাই শুকনো রুটী চিবুচ্ছে ওরা। হয়তো বা এসব খাওয়া তাদের অভ্যাস নেই। সকলেরই

চেহারা সুন্দর, ভদ্রঘরের সন্তান তাতে কোনো ভুল নেই। বনহুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, মনে মনে ফুলছে সে ক্রুদ্ধ সিংহের মত।

লোকটার ইংগিতে শিশু তিনটিকে শুইয়ে দেওয়া হলো।

ছেলেটির সংজ্ঞা ফিরে এসেছিলো, ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো। মেয়েটি তখনও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছে। বনহুরের শরীরের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠলো, এইদণ্ডে এদের সবাইকে খতম করতে ইচ্ছে করছিলো তার কিন্তু অতি কষ্টে সংযত হয়ে রইলো, দেখতে লাগলো এরা কি করে?

এমন সময় বালকদের মধ্যে একজন কেঁদে উঠলো—আমি কোথায়, আমাকে তোমরা কেন ধরে আনলে?

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ যমদূতের মত লোকটা বালকটির গলা টিপে ধরলো। পরক্ষণেই ঠাই করে বসিয়ে দিলো একটা চড় ওর গালে।

ছেলেটা চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, তৎক্ষণাৎ ভয়ে কুঁকড়ে গেলো যেন গলাটা তার। কাঁদা বন্ধ হলো, অসহায় চোখে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

যতদূতটা এবার আর একটা বালকের চুল ধরে একটা হেচ্‌কা টান মারলো।

যে ছেলেটা কাঁদা বন্ধ করেছিলো সে আবার ভয়ে কেঁদে উঠলো। যার চুল ধরে টান দিলো সে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলো কিন্তু কাঁদবার সাহস পেলো না।

মালগুলোকে দেখে নিয়ে বললো— জলিল, এদের আজ রাতেই চালান দিতে হবে, সবাইকে সন্ধ্যার আগেই ঠিক করে নিবি। এবার বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—আর তোর পাওনাটা মিটিয়ে দি, চলে যা। হাঁ, বলবি নতুন মাল যেন শীঘ্র করে পাঠায়।

যমদূতের মত ভীষণ চেহারার লোকটা তার অনুচরদের মাল চালান দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে ফিরে চললো, বনহুর তাকে অনুসরণ করলো।

পুনরায় ফিরে এলো বনহুর সেই কক্ষে, যে কক্ষে প্রবেশ করে সে দেখতে পেয়েছিলো ছেলেধরাদের সর্দার বা মালিককে। এবার লোকটা একটা থলে বনহুরের হাতে দিয়ে বললো—এতে টাকা আছে, তোদের মালিককে পৌঁছে দিবি।

আচ্ছা মালিক।

টাকার থলে হাতে বেরিয়ে যায় গফুরের বেশে বনহুর। কি ভয়ঙ্কর নির্দয় নর শয়তানের দল এরা। বনহুরের এখন কি করা কর্তব্য ভেবে নিলো, এর শেষ না দেখে সে এদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেবে না।

ছেলেধরার ঘাটি থেকে বনহুর বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো বটে কিন্তু ফিরে গেলো না ঢাকা শহরে, সে একটা গোপন স্থানে আত্মগোপন করে ড্রেস পাল্টে চাষী সেজে নিলো।

আজ রাতে চালান যাবে ছেলেগুলো, কোথায় চালান যাবে না দেখে না জেনে শান্তি নেই বনহুরের। কিন্তু সারাটা দিন তাকে আত্মগোপন করে কাটাতে হবে।

বনহুর একজন লোকের কাছে জেনে নিলো এ গ্রামটির নাম বাঘহাটা। মনে মনে বললো সে, বাঘহাটাই বটে। যে একবার এ গ্রামে আসে সে আর ফিরে যায় না। বিশেষ করে হারানো ছেলেমেয়েগুলোর কথাই স্মরণ হলো তার।

বাঘের কবলে জীব পড়লে যেমন তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি ছেলেধরার কবলে পড়লে আর তাদের কোনোদিনই ফিরে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। বনহুর তাই এই ছেলেধরা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করলো।

বনহুর একটি চাষার ছদ্মবেশে প্রবেশ করলো গ্রামটার মধ্যে। এখন তার হাতে প্রচুর অবসর আছে। রাত্রি ছাড়া চালান যাবে না। কাজেই সমস্ত দিনটা বনহুর হাতে পাচ্ছে।

এ গ্রামে বনহুর সম্পূর্ণ নতুন, কাজেই তাকে বেশি করে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হলো না। সাধারণ চাষীবেশে সে প্রবেশ করলো গ্রামের মধ্যে।

ছায়াঘন শ্যামল পল্লীজননীর স্নিগ্ধরূপ বনহুরের চোখে সৃষ্টি করলো এক নতুন পরিবেশ। দু'পাশে শস্যক্ষেত, মাঝখান দিয়ে আইল। আইলের উপর দিয়ে লোক চলাচল করে থাকে। ধান গাছের সবুজ পাতাগুলো ঝিরঝিরে বাতাসে দোল খাচ্ছে যেন চঞ্চল পল্লী, বালিকার বিক্ষিপ্ত আঁচলখানা লুটোপুটি খাচ্ছে।

বনহুর মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আর এগুচ্ছে।

শীতল বাতাস তার সমস্ত শরীরে যেন এক মধুর পরশ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

এগুচ্ছে বনহুর।

ক্ষেত ছাড়িয়ে গ্রাম।

ধূলো ছড়ানো সরুপথ দু'পাশে গাছপালা আর লোকজনের বাড়িঘর। টিনের আর খড়ের চালাঘরই বেশি; ইট পাথরে গড়া দালান কোঠার বালাই নেই একেবারে।

বনহুর নিপুণ দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আর এগুচ্ছে। কোথাও বা চাষী লাঙ্গল কাঁধে জমির দিকে চলেছে। আগে আগে এগুচ্ছে গরু দু'টো, পেছনে চাষী।

দুটো রাখাল বালক একপাল গরু নিয়ে চলেছে। ছোট বড় অনেকগুলো গরু, কোনোটা মোটা—সোটা কোনোটা বা হাড়জিরজিরে কঙ্কালসার। বাছুরগুলো গাভীগুলোর পাশ কেটে কেটে এগুচ্ছে। একটা বাছুর একটু পিছিয়ে পড়েছিলো, হাম্বা হাম্বা শব্দ করে ছুটে এলো মায়ের পাশে। গাভী সন্তানকে না দেখে একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছিলো। এতোক্ষণে যেন শান্ত হলো জননী সন্তানকে কাছে পেয়ে।

গাভী আর বাছুরটির কার্যকলাপ লক্ষ্য করে বনহুরের মনে উদয় হলো ছেলেধরার কবলে আটকা পড়া শিশুগুলোর কথা। মা-হারা সন্তানগুলোর অবস্থা ঠিক এমনিই হয়েছে। মাকে না পেয়ে এরাও উতলা হয়ে উঠেছে ভীষণভাবে।

হঠাৎ নারী কণ্ঠের হাসির শব্দে বনহুর ফিরে তাকালো—ওদিকে নজর পড়তেই দেখলো, একটি পুকুরঘাটে কয়েকটি যুবতী স্নান করছে আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। অর্ধবসনা সিক্ত নারীমূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না বনহুর। নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে আছে, জীবনে বনহুর বহু নারী দেখেছে কিন্তু এমন সরল স্বাভাবিক গ্রাম্য নারী সে দেখেনি। ঠিক যেন দীঘির নীল জলে সদ্য ফোটা কয়েকটি পদ্মফুল।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভুলে গেছে সে,—এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তার মোটেই উচিত নয়। তন্ময় হয়ে দেখছে বনহুর যুবতীগণের স্বচ্ছ ভাবধারা।

একজনকে লক্ষ্য করেই যুবতীগণ হাসাহাসি করছে। কেউ বা তার দেহে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে, কেউ বা মৃদু চাপ দিচ্ছে ওর গণ্ডদ্বয়ে, কেউ বা গানের সুর তুলে টিপ্পনী কাটছে।

হঠাৎ একটা ছায়া এসে পড়লো দীঘির বুকে।

যুবতীগণ মুহূর্তে ভীত হরিণীর মত তটস্থ হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি সিক্ত বসনগুলো জড়িয়ে নিচ্ছে দেহে। নিমিশে ওদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, অন্ধকার কালো হয়ে উঠেছে প্রতিটি যুবতীর মুখ।

দীঘির বুকে এতোক্ষণ যে উচ্ছ্বাসিত হাসির উচ্ছ্বাস এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করে চলেছিলো সহসা তা স্তব্ধ হয়ে যায়। জোছনা-প্লাবিত বসুন্ধরা যেমন চন্দ্রগ্রহণের অন্তরালে ঢাকা পড়ে যায় ঠিক তেমনি অবস্থা হয়েছে ওদের।

বনহুর ঘাটের ওপাশে তাকাতেই আড়ষ্ট হয়ে পড়লো, ওপারে এসে দাঁড়িয়েছে সেই যমদূত ছেলেধরাদের মালিক লোকটা। তার দু'পাশে দু'টি বলিষ্ঠ লোক।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর লুকিয়ে পড়লো দীঘির পাড়েই একটা ঘন গাছের আড়ালে। সে লুকিয়ে পড়লেও তার দৃষ্টি রইলো ঘাটের ওপারে যমদূতের মত লোকটি ও তার সঙ্গীদ্বয়ের দিকে। বনহুর লক্ষ্য করলো, যুবতীগণ ভিজে কাপড় যতদূর সম্ভব দ্রুত দেহে জড়িয়ে নিয়ে কলসীগুলো কাখে তুলে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

ততক্ষণে শয়তান তিনজন এসে দাঁড়িয়েছে, যুবতীগণের পথ আগলে বিশ্রী কুৎসিত হাসি হাসছে ওরা।

একজন লোক বললো—মালিক এই মেয়েটির কথাই আপনাকে বলেছিলাম।

মাঝখানের যুবতীটিকে দেখিয়ে দেয় লোকটা।

এবার মালিক বিদঘুটে হাসি হেসে বলে—চমৎকার তোমার পছন্দ হারান। এবার মালিক বেটা খপ্ করে হাত ধরে ফেলে মাঝের যুবতীর।

এতোক্ষণ ভয়ে যুবতীগণ কুঁকড়ে গিয়েছিলো, হাজার হলেও এরা পল্লীর সরল-সহজ বালা, চট করে কিছু বলতেও পারছে না, চীৎকার করে কাঁদবে তাও হচ্ছে না। অসহায় চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলির ছাগলের মত কাঁপছে।

যমদূত যখন যুবতীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে শুরু করলো তখন সবগুলো যুরতী হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো। কেউ বা চীৎকার করে উঠলো— বাবা গো,মা গো, নিয়ে গেলো বাঁচাও.............বাঁচাও---

চীৎকার শুনে ছুটে এলো কয়েকজন গ্রাম্য লোক। কিন্তু যেমনি মালিক ও তার সঙ্গীদ্বয়ের উপর দৃষ্টি পতিত হলো অমনি পিছু হটে যে যেদিকে পারলো সরে পড়লো।

বনহুর আড়ালে থেকে সব লক্ষ্য করছিলো, সে গ্রামবাসীদের ভীতু ভাব দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। একজনও এগুনোর সাহস পাচ্ছে না, সবাই যেন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছে কেঁচোর মত। কিন্তু এতো ভয় কেন বুঝতে পারে না বনহুর।

যুবতীটিকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে পুকুরঘাটের দিকে।

বনহুর এবার স্থির থাকতে পারলো না, আড়াল থেকে বেরিয়ে দ্রুত শয়তান তিনজনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ পথ রোধ হওয়ার মালিক ও তার সঙ্গীদ্বয় দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলো। একজন বলে উঠলো—কে তুই?

বনহুর ওর কথার জবাব না দিয়ে মালিকের মুখ লক্ষ্য করে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটিসহ মালিক বিরাট বপু নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

ছাড়া পেয়ে যুবতী উঠে দাঁড়ালো দ্রুত গতিতে। এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো সে।

অদূরে ভয়বিহ্বল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে অন্যান্য যুবতী বধূগণ। সঙ্গিনীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তাই ওরা কেঁদে আকুল হচ্ছে, কেউ পালাচ্ছে না তাকে ছেড়ে। সবাই দেখছে কি হয় সঙ্গিনীর।

আচমকা একটি লোককে তাদের আক্রমণকারীর উপর আক্রমণ চালাতে দেখে ওরা হকচকিয়ে গেলো, সবাই বিস্ময়ে থ' মেরে দেখছে— কে এই লোক, একে তো ইতিপূর্বে কেউ এখানে দেখেনি।

এতোক্ষণ যে সব গ্রামবাসিগণ যুবতীদের চীৎকারে এসে পড়ে পুনরায় পালানোর চেষ্টা নিচ্ছিলো তারা দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। অবাক তারাও কত হয়নি—কে এই যুবক!

বনহুরের ঘুষি খেয়ে লোকটা ফুলে উঠলো সিংহের মত; হুড়মুড় করে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

শয়তানের সঙ্গীদ্বয়ও রুখে দাঁড়িয়েছে ভীষণভাবে। এই মুহূর্তে যেন বনহুরকে ওরা নিঃশেষ করে ফেলবে।

যমদুতের মত লোকটা হুঙ্কার ছাড়ালো—কে তুই?

বনহুর জামার হাতাটা আরও কিছুটা গুটিয়ে নিয়ে দাঁত পিষে বললো—এ গ্রামের লোক।

ওঃ খুব তো সাহস! জানিস্ আমি কে?

তুমি কে জানার কোনো দরকার নেই। কিন্তু কোন্ সাহসে মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছো?

কি বললি? জানিস্ এ গাঁয়ে আমি মাতব্বর। এরা সবাই আমার চাকর।

আর একজন বললো—এ বেটা এতোদিন ছিলো কোথায় তাই জানে না। নিশ্চয়ই এ বাইরে থেকে এসেছে।

এবার আর একজন বলে—মালিক, ওর কথা শুনবেন না, চলুন, ওকে নিয়ে চলুন।

মালিক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার বনহুরের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে পুনরায় যুবতীর হাত ধরে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে ঝাপিয়ে পড়ে বনহুর, পর পর কয়েকটা ঘুষি তার নাকে মুখে এসে পড়ে। লোকটাও আক্রমণ করে এবার বনহুরকে। ওর সঙ্গের অনুচরদ্বয়ও ঝাপিয়ে পড়ে ভীষণভাবে।

কিন্তু বনহুরের কাছে ওরা বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। কারো নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে, কারো দাঁত ভেংগে যায়, কারো ঠোঁট কেঁটে দু'ফাঁক হয়ে পড়ে। বনহুরের এক এক মুষ্ঠিঘাতের আঘাতে নাজেহাল হয়ে পড়ে শয়তান তিনজন। বহু লোককে ওরা কাবু করেছে এতোদিন, আজ সামান্য একজন চাষীর কাছে এমনভাবে পরাজয়! চাচা আপন জান বাঁচা অবস্থা হয়ে পড়লো তাদের। বনহুর ক্ষেপে গেছে, সে আর থামতে চায় না; ওরা পালাতে চেষ্টা করছিলো কিন্তু বনহুর পালাতে দিলে তো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাবু হয়ে পড়লো তিন শয়তান। সর্দার লোকটাই বেশি কাবু হলো, ওর নাক দিয়ে যেভাবে রক্ত গড়াতে শুরু করেছে তাতে তার অবস্থা কাহিল। শেষ পর্যন্ত কোনো রকমে পালিয়ে গেলো তিনজন।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তার কপালেও এক জায়গা কেটে গিয়েছিলো, রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো কপাল বেয়ে।

এতোক্ষণ অবাক বিস্ময়ে দুরে দাঁড়িয়ে গ্রামবাসী এই অদ্ভুত দৃশ্য লক্ষ্য করছিলো। এতোদিন ঐ শয়তান মাতব্বর লোকটাকে মেনে এলেও মনে মনে তাকে ঘৃণা করতো ওরা সর্বান্তকরণে। মাতব্বর সেজে গ্রামবাসীদের সর্বনাশ করাই ছিলো তার কাজ। কেউ কোনো প্রতিবাদ করতে পারতো না বা সাহসী হতো না। যেদিন যাকে খুশি—স্ত্রী-কন্যা-বধূকে জোরপূর্বক নিয়ে যেতো, তাদের নিয়ে চালাতো নানারকম আমোদ-প্রমোদ। গ্রামবাসিগণ টু শব্দ উচ্চারণ করতে সাহসী হতো না কারণ এ গ্রামের মাতব্বর ও চেয়ারম্যান হলো এই যমদুত। নারিকেল ব্যবসার জাল বিছিয়ে সে ভিতরে ভিতরে ছেলেচুরির ব্যবসা ফেঁদে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে চলেছে।

অন্যান্য গ্রামাঞ্চলের মত এ গ্রামটা এখনও শিক্ষার আলোতে আলোকিত হয়নি, সবাই এখানে অশিক্ষিত—মূর্খ, বুদ্ধিহীন। অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এরা গরীবও বটে, জমি চাষ করে কিন্তু পেট পুরে খাবার সংস্থা জোটে না। পরনে জামা-কাপড় নেই, মাথায় তেল নেই—তবু সর্বদা খেটে চলেছে, আর কিসে গ্রামের মাতব্বর খুশি থাকবে, সেই চিন্তা করে সর্বদা।

শয়তান মাতব্বর তার সঙ্গীদ্বয়সহ উধাও হতেই গ্রামবাসিগণ এগিয়ে এলো, ঘিরে দাঁড়ালো বনহুরকে। যুবতীটি এখনও থরথর করে কাঁপছে, সে নির্বাক ভয়াতুর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে, ভাবছে কে এই লোক যে তাকে বাঁচিয়ে নিলো! যুবতী গ্রাম্যবালা হলেও সে মানুষ, বনহুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো তার নারী হৃদয়।

সেই মুহূর্তে একটি বৃদ্ধ লোক হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো, সমস্ত শরীর তার ঘামে ভিজে গেছে, রোদে দেহটা যেন পুড়ে কালো হয়ে উঠেছে পোড়া কয়লার মত।

হন্তদন্ত হয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতেই যুবতী ঝাপিয়ে পড়ে বুকে—বাপজান.....বাপজান.....

মা, তোরে নাকি বদমাইশ মাতব্বর ধইরা নিয়া যাইতে লইছিলো।

হাঁ বাপজান, আমারে মাতব্বর তার গুদামে লইয়া যাইতে লইছিলো। উনি আমারে বাঁচাইয়া লইছেন। বনহুরকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যুবতী।

বুড়ো ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বনহুরকে—বাপ তুমি কে-ডা আমার মাইয়ারে বাঁচাইলা লইছো?

বনহুর হাতের পিঠ দিয়ে কপালে গড়িয়ে পড়া রক্ত মুছতে মুছতে বললো—আমি তোমাদের দেশেরই একজন। তোমাদের মতই মানুষ। যাও, তোমার মেয়েকে ঘরে নিয়ে যাও।

বুড়ো বনহুরের মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে ছিলো, খুশি যেন ধরছে না কিন্তু মুখে কোনো কথা বের হচ্ছে না তার। এমন কথা এ গাঁয়ে কেউ তো বলে না, আহা কি শান্ত গম্ভীর পৌরুষভরা কণ্ঠ! বুড়োর অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হলো, মন যেন গলে গেলো কিন্তু ভাষা প্রকাশের ক্ষমতা নেই তার। কন্যাকে বললো—চল্ সখিনা, ঘরে চল্।

সখিনা বললো—বাপজান, লোকডারে আমাগো ঘরে যাইতে কইলা না? আহা মাথাডা কাইট্যা গেছে, ওষুধ লাগাইয়্যা দিবা না?

তাই তো, কে তুমি বাপধন—কই যাইব্যা, চলো আমাগো ঘরে চলো।

বনহুর না গিয়ে পারলো না।

❑

একখানা কাঁসার থালার চিড়া-গুড় আর দুধ এনে সম্মুখে দাঁড়ালো সখিনা—খাও! কি আর দিমু, চিড়া-গুড় আছিলো তাই দিলাম।

বনহুর তাকালো যুবতীর মুখের দিকে, সরল-সুন্দর একখানা মুখ। হায়, তখন যদি বনহুর এসে না পড়তো তাহলে এতোক্ষণ এই যুবতীর সর্বস্ব লুটে নিতো ঐ শয়তান লম্পট দূরাচার পাষণ্ড। দৃষ্টি নেমে এলো ধীরে ধীরে যুবতীর সুডোম কোমল হস্তখানার উপর। একটু পূর্বেই নিষ্পেষিত হয়েছিলো এই পবিত্র হাতখানা অপবিত্র এক নরপিশাচের হস্তস্পর্শে। বনহুরের বুকখানা ব্যথায় টনটন করে উঠলো। হাত বাড়িয়ে যুবতীর হাত থেকে চিড়া-গুড়ের থালা আর দুধের বাটিটা নিয়ে নিজের সামনে রাখলো।

বেশ ক্ষুধা বোধ করছিলো বনহুর, খেতে শুরু করলো। একটা ঝকঝকে কাঁসার গেলাসে ঠাণ্ডা পানি রাখলো সখিনা—পানি খাইও।

বনহুর খেতে খেতে বললো—আচ্ছা।

সখিনা বনহুরের পাশে একটা পিড়া টেনে বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছিলো, মনে হচ্ছিলো সখিনা যেন ওকে কতদিন থেকে চেনে।

বনহুর বললো—তোমার নাম সখিনা বুঝি?

হাঁ, আমার নাম সখিনা।

এ বাড়িতে কে কে থাকো তোমরা?

বাপজান আর আমি, মা মইর্যা গেছে অনেকদিন।

তোমার ভাই-বোন বা আর কেউ নেই?

না, আমাগো আর কেউ নাই। থাকলে আর অতো চিন্তা অইতো না।
তাহলে তোমার বাপজান যখন বাইরে যান, কে তোমার কাছে থাকবে?
একাই থাকতে হয়, কে আর থাকবো কও?
এখন তোমার একা থাকা নিরাপদ নয় সখিনা। আবার ঐ শয়তান হামলা চালাতে পারে।
তা ঠিক কইছো তুমি, কিন্তু কি করমু কও, আমাগো নিয়া বাপ থাকলে পেট ভরবো কেমনে? কথাগুলো বেশ দুঃখভরা করুণ কণ্ঠে বললো সখিনা।
বনহুর বললো—তোমাদের কেউ আত্মীয়-স্বজন নেই?
থাকলি কি অইবো, মাতব্বরের ভয়ে কেউ আমাগো আগলাবি না। সবাই তারে ভয় পায় কিনা। তা আজ থ্যাইকা আমার কি অইবো, আমার বুড়া বাপেরে মাইর্য্যা ফেলবো। হায় কি অইবো......
আঁচলে চোখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো সখিনা।
বনহুরের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিলো, সান্ত্বনা দিয়ে বললো—সখিনা, তুমি ভয় পেও না, আমি তোমাকে দেখবো।
এমন সময় বুড়ো দুটো ডাব নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে—বাপ, তোমারে কি কইয়্যা দোয়া দিমু ভাইবা পাইতেছি না। আমার মাইয়ার ইজ্জৎ বাঁচাইছো, আবার তুমি দেখব্যা কইতেছো?
হাঁ, যতক্ষণ ঐ শয়তান মাতব্বরের জান শেষ না করেছি ততক্ষণ আমি তোমাদের দিকে নজর রাখবো।
আস্তে, কও বাপ্ কোথা থাইক্যা কে শুইন্যা ফেলবো আমাগো জান নিয়া নিবো।
বনহুর ভাবলো, মিথ্যা নয়, চাষী যা বলছে তা সম্পূর্ণ সত্য। এ গ্রামের হর্তাকর্তা ঐ নর পিশাচ শয়তান, ছেলেধরার সর্দার। কি সুন্দর একটা জায়গা বেছে নিয়েছে সে তার ব্যবসা চালানোর জন্য।
বনহুর যখন চিন্তা করছিলো বুড়ো তখন ডাব দুটো কেটে গেলাস ভর্তি করে কন্যার হাতে দেয়—দেও, ওরে খাইতে দেও। আচ্ছা বাপ, তোমার নাম ডা কি এতোহন শোনা অয়নি?
বনহুর হেসে বললো—আমার নাম আলম।
কি কইল্যা—আলম? ওই নাম তো আমাগো দেশে ধানের অয়। তারে কয় আমন ধান।
না না আমন নয়—আলম।
ও আলম?
হাঁ।
তোমারে আমি আলম আলী কইমু?
একটু হেসে বললো বনহুর—আলম আলী না বলে খালি আলম বলো।
ক্যান? তবে আলম মিয়া কইমু?
আচ্ছা, যা ভাল লাগে তাই বলো।

সখিনা ডাবের পানিসহ গেলাসটা বাড়িয়ে ধরে—নেও।
না, আর খেতে পারবো না।
সেকি কও বাপ, ডাবের মিঠা পানি খাইয়া লও। সুন্দরবন দেশের লগে আইছো, এহন এত ডাব খাইব্যা।
তাতো খেতেই হবে। বনহুর ডাবের পানির গেলাসটা হাতে নিলো সখিনার হাত থেকে।
কথায় কথায় বনহুর জানতে পারলো, এ গ্রামটা প্রায় খুলনার কাছাকাছি সুন্দরবন অঞ্চলের অদুরে কোনো এক জায়গা।
এখানে বেশিক্ষণ বিলম্ব করার সময় নেই বনহুরের, যেমন করে হোক ছেলেধরার দলে যোগ দিয়ে মালের সঙ্গে যেতে হবে। কিন্তু এদিকে এই অসহায় যুবতী আর তার পিতা—এদের কি করে রক্ষা করবে?
বনহুর এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে বললো—সখিনা, তুমি তৈরি হয়ে নাও, আমার সঙ্গে তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।
বুড়ো তাকালো, কেমন যেন একটু অবিশ্বাসের আভাস তার মুখে।
বনহুর হেসে বললো—ভয় করো না, তোমার মেয়েকে শয়তান মাতব্বরের কবল থেকে বাঁচানোর জন্যই বলছি।
কই নিয়া যাইবা আমার মাইয়া?
আমি যেখানে যাবো সেখানে?
কই যাইবা?
তোমাদের মাতব্বরের বাড়িতে।
সেকি কও বাপ? বুড়োর চোখখানা বড় হয়ে উঠে।
বনহুর বলে—তুমি যদি আমার উপর ভরসা রাখো তবে ওকে আমার সঙ্গে যেতে দাও।
কি আর কইমু, তুমি ওরে বাঁচাইছো, আবার তুমি যদি ওরে গলা টিইপ্যা মারতি চাও, আমি কি কইমু কও, যা ভাল হয় করো।
বনহুর বলে উঠে—শীঘ্র করে একটা ছেঁড়া কাপড় পরে নাও।
সখিনা তাই করে।
একটা ছেঁড়া কাপড় পরে বনহুরের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।
বনহুর ওর আঁচলখানা মাথায় তুলে দিয়ে ঘোমটা টেনে দেয়।
বুড়ো অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে। কোনো কথা বলতে পারে না।
বনহুর সখিনার হাত ধরে দ্রুত বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

পরবর্তী বই

সুন্দরবনের অন্তরালে

এই সিরিজের পরবর্তী বই
সুন্দরবনের অন্তরালে
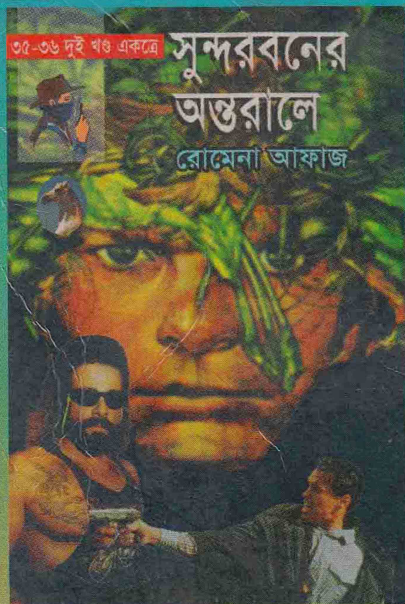
আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন

পরিবেশকঃ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা